রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর
রচনা সংকলন

সম্পাদনায়
মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

মোরুবান বেগম

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর—

রচনা সংকলন

সম্পাদনায় ঃ মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

প্রকাশিকা :
রাবেয়া খাতুন চৌধুরী
কান্দিরপাড়, কুমিল্লা

প্রথম প্রকাশ :
মে, ১৯৮২

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

প্রচ্ছদ ০ পরিকল্পনায়
হাশেম খান
০ রূপায়নে
সুরঞ্জিত দত্ত

মূল্য : ২০'০০ বিশ টাকা

পরিবেশনায় :
(১) আহমদ পাবলিশিং হাউজ
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেইন, ঢাকা
(২) শাহিন লাইব্রেরী
নিউ মার্কেট, কুমিল্লা

মুদ্রণে : সমবায় প্রেস, কুমিল্লা

বাংলাদেশের
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ
"আমার দেশের চাষা"র
মাটিমাখা হাতে—

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

ভূমিকা

পরিচিতি

জন্ম : ১৯০৭ সালে নোয়াখালী শহরে। পিতা হাজী আবদুর রশীদ খান ছিলেন আইনজীবী, বিদ্যোৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তি। কলকাতা করপোরেশনের একজিকিউটিভ অফিসার। তার প্রপিতা রাজস্ব দারোগা সাবেদ খান ছিলেন ঢাকা নবাবগঞ্জ থানার আজিজপুর গ্রামের অধিবাসী। তিনি বাসস্থান স্থাপন করেন নোয়াখালী শহরে। তার পুত্র আবদুল আজিজ খানের পুত্র আবদুর রশীদ খান। মায়ের নাম হাজেরা খানম।

রাজিয়া খাতুনের লেখাপড়া শুরু হয় আলোয় ঝলমল কলকাতা শহরে, পার্ক সার্কাসে, পিতৃভবনে, গৃহ শিক্ষকের কাছে। বাড়ীতে বাবার পারিবারিক পাঠাগারের গ্রন্থরাজি তার অনুসন্ধিৎসু মনকে আকৃষ্ট করে। জ্ঞানপিপাসু বালিকা রাজিয়া জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিয়েছে বইয়ের রাজ্যে নিজকে ডুবিয়ে দিয়ে। অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন পিতা-মাতা। তৎকালীন শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র কলকাতার পরিবেশে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না মুক্তমনা রাজিয়া যতই জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিবেদন করে, ততই মুসলমান সমাজের নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতায় মন পীড়ায় উদ্বিগ্ন হয়। হাতে কলম লন।

বিবাহ পূর্বকাল থেকেই পত্র পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। তখন রাজিয়া খাতুন নামেই লিখতেন। বিবাহের পর নামের শেষে চৌধুরাণী সংযোজন করেন। এ দু' নামেই তাঁর লেখা প্রকাশিত। 'উপহার' কবিতা সংকলনটি বিবাহপূর্ব সময় দমদম, কলিকাতা থেকে ৫ই মাঘ ১৩৩২ সালে প্রকাশিত। পাঁচটি কবিতার প্রথম দু'টি লেখা ১৯।৯।২৪ আর শেষটি '১৩২৭ ২২শে জ্যৈষ্ঠ। তার লেখার ইতিহাসে নিজের কথায় দেখা যায়, '১৩২৭ সনের

২২শে জ্যৈষ্ঠ হতে সেটার জন্ম, সেই আমার সর্বপ্রথম লেখা। কিন্তু এগুলি সেই বার বছর বয়সের।'

১৩৩২ সালে বিবাহ হয় কুমিল্লা সুয়াগাজী গ্রামের জমিদার তফাজ্জল আহমদ চৌধুরী ওরফে আনু মিয়ার পুত্র আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীর সাথে। মাত্র দশ বছর বিবাহিত জীবন। তারপরই ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে অকালমৃত্যু, মাত্র ২৭ বছর বয়সে। তিনি দুই পুত্র ও তিন কন্যার জননী। প্রথম সন্তান শিশুপুত্র সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুতে তিনি লিখেন 'শোকাতুরা' কবিতাটি। লিখেছেন :

প্রথম আশার প্রথম তৃপ্তি, আঘাতেও আদি তুই
তাই দিনু আজ প্রভুরেই তোরে। এ সুখ কোথায় থুই ?
মোর ছিলি শুধু দুদিনের সুখের স্বপ্নসম
চিত্তের মাঝে অসীম বিত্ত সন্তান মনোরম ॥

অন্য পুত্র জামালউদ্দীন আহমদ চৌধুরী এডভোকেট আর দ্বিতীয় কন্যা রাবেয়া খাতুন চৌধুরী জাতীয় সংসদ সদস্যা। প্রথম কন্যা সালেহা খাতুন ও তৃতীয় কন্যা জোবেদা খাতুন।

০ ০ ০ ০ ০ ০

ছাত্র জীবনে প্রথম পড়েছি বার পংক্তির কবিতা 'চাষা'। এখনও টেক্সট্‌বুক বোর্ডের সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে তা ''যোজিত। কবিতাটি মুলতঃ চল্লিশ পংক্তির। শিক্ষক জীবনে ছাত্রদের পড়িয়েছি কবিতাটি। শুধু ভালো লাগে নাই। বিস্মিত হয়েছি। মনে জেগেছে বাংলার অগণিত নিপীড়িত চাষীদের সম্পর্কে কোন কবি কোন দিন এমন দরদ দিয়ে এমন সুন্দরভাবে তাদের কথা তুলে ধরেছে কি ? এর সমকক্ষ কোন কবিতা বাংলা সাহিত্যে আছে কি ? তাও আবার এক মুসলিম মহিলা কবির। চমৎকার তার প্রারম্ভ :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।

কবিতার জন্মইতিহাস আরো চমৎকার। স্বামী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী জমিদার সন্তান। উকিল হয়েও দেশের নিঃপীড়িত জনগণের দুঃখ দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তাদের মংগল সাধনে যোগ দিয়েছেন রাজনৈতিক সংস্থা কৃষক প্রজাপার্টিতে। আন্দোলন জোরদার করার জন্য জনসংযোগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে জনসমাবেশে, সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে প্রচারকার্য চালান। তেমনি একবার কয়েকদিন ছিলেন কুমিল্লা (ত্রিপুরা) জেলার ফরিদগঞ্জ থানার রূপসা অঞ্চলে। সেখান থেকে স্ত্রী রাজিয়া খাতুনকে লিখেন একটা চিঠি। পাঠান তা বিশ্বস্ত চাকর হনুয়ার মারফত। শেষাংশে একটা ছোট পংক্তি—'এই ভবঘুরে চাষা মানুষকে ভাল লাগে কি তোমার ?' এ উক্তির পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে। বিবাহপূর্ব জীবনে কলকাতা-বাসিনী স্ত্রীর প্রতি। আর নিজকে চাষা উল্লেখ করায় পত্রবাহক হনুয়ার হাতে বিবাহের দ্বিতীয় বর্ষে প্রীতিভাষণের সংগে গেল 'চাষা' কবিতার কপি। চল্লিশ পংক্তির দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালে নওরোজ পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম খণ্ডে। প্রকাশের সংগে সংগেই উচ্চমানের কবিতাটির বক্তব্য ও জনপ্রিয়তা তাকে কবির সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

বহুদিন থেকে এ কবিকে জানার জন্য, তার অন্যান্য লেখার সংগে পরিচিত হওয়ার জন্য মনে ছিল অনেক জিজ্ঞাসা। কুমিল্লার এ মহিলা কবিকে জানার আগে আমি তার পূর্বসুরী মহিলা কবি-সাহিত্যিক, বাংলাদেশের প্রথম মহিলার সাহিত্য প্রকাশনী 'রূপ জালালের (১৮৭৬) রচয়িতা নওয়াব ফয়জুননেসা চৌধুরাণীর লেখা সম্পর্কে কিছুটা অনুসন্ধান করি। 'রূপ জালাল' পুনঃ প্রকাশের চেষ্টা চালাই। সুখের বিষয় বাংলা একাডেমী তা প্রকাশে রাজী হয়েছে। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর জীবিতকালে প্রকাশিত পাঁচটি কবিতার সংকলন 'উপহার' (১৩৩২) আর সাতটি গল্পের সংকলন 'পথের কাহিনী'। গল্প সংকলনটি এখন দুষ্প্রাপ্য। কোনক্রমেই উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

১৯৭৫ সালে কুমিল্লার শিশু কিশোর সংগঠন 'সত্যসেনার' পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী 'নকীবে'র বিশেষ সংখ্যা 'আমাদের কুমিল্লা'য় রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী নামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি (পৃঃ ৪৫-৫১)। যতই অনুসন্ধান করি ততই এ কবি, প্রাবন্ধিক, ছোট গল্পকারের প্রতিভার বহুমুখী স্ফুরণের দিকে নজর পড়ে। তার পরিবারের সন্তান সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনের সংগে তার লেখা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। লেখাগুলি উদ্ধার করে একটা সংকলন প্রকাশের প্রস্তাব দেই। কিন্তু প্রথমে তাদের অনেকের মধ্যেই কোন উৎসাহজনক সাড়া পাইনি। তবে তার পুত্র জামাল উদ্দীন চৌধুরীর একক এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় পিতা আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী সম্পর্কে 'রাজবিরোধী' নামে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ অতি মূল্যবান দলিলাদিসমৃদ্ধ একটা জীবনী প্রকাশ করেন। তাতে কারো কারো মনের গতি বদলায়।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর সুযোগ্যা কন্যা রাবেয়া খাতুন চৌধুরাণী এখন একজন সংসদ সদস্যা। বিশিষ্টা সমাজকর্মী হিসাবে সুপরিচিতা। মায়ের কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ-গল্পের একটা সংকলন প্রকাশে তার আগ্রহ মাতৃভক্তি ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার স্মারক হিসাবে এ প্রকাশনার উদ্যোগ। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রত্নরাজি সংগ্রহের কঠিন দায়িত্ব অনেকটা আমার। অনুসন্ধিৎসু মনের তৃপ্তির জন্যই সানন্দে তা গ্রহণ করি এজন্য যে তার লেখাগুলি যেন সংকলনের মধ্যে কিছুটা রক্ষিত হয়। সবলেখা কিন্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে জানলাম জনাব মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লা রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী সম্পর্কে লেখার জন্য তার প্রকাশিত বই দু'খানা এবং 'সাপ্তাহিক সওগাত' ও 'নয়া বাংলার' সংগৃহীত কপিগুলি তাদের সুয়াগাজীর বাড়ী থেকে নিয়ে গেছেন। আশ্বস্ত হয়েও নিরাশ হলাম যখন মাহফুজ

উল্লাহ সাহেব বললেন তিনি সব হারিয়ে ফেলেছেন, কিছু উইতে নষ্ট করে ফেলেছে। তারপর হারান-লুকান অজান্তে রক্ষিত লেখার সন্ধানে ছুটাছুটি শুরু করলাম। এখানে ওখানে, যেখানে থাকার সম্ভাবনা আছে।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী লিখেছেন সমসাময়িক মাসিক সওগাত, নওরোজ, মোহাম্মদী, সাহিত্যিক, সাপ্তাহিক সওগাত ও নয়া বাংলায়। কোথায় পাওয়া যায়? ১৯৩৪ সাল অর্থাৎ তার মৃত্যু-বর্ষের পূর্বেকার এসব পত্রিকা। আমার নিজের কাছে মাসিক মোহাম্মদী ও মাসিক সওগাতের কয়েকটা সংখ্যা ও বিশেষ বার্ষিকী আছে। তার মধ্যে কিছু লেখা পেলাম। তারপর প্রথম গেলাম তার ভাইদের বাড়ী নোয়াখালীতে হরিনারায়ণপুর গ্রামে। নোয়াখালী শহর নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় এখানে তারা বসতি স্থাপন করেছেন। মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাতের কয়েকটি বাঁধানো কপি থেকে কয়েকটি কবিতা সংগ্রহ করলাম। গেলাম বারবার অনেকবার ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমীতে। এখানে দু'টি বিভাগে অনেকগুলি পত্রিকা সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে নাই। বিক্ষিপ্ত সংখ্যা। প্রতিটি মাসিক পত্রিকার সূচীপত্র তল্লাসী বিরক্তিকর ও চোখ-ধরা হলেও ধৈর্যের সাথে দেখতে হয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা। তারপর কয়েকবার গেলাম সওগাত সম্পাদক জনাব নাসিরউদ্দিন সাহেবের অফিসে। তিনিত শুধু সওগাত সম্পাদকই নন। তিনি বিংশ শতকের উদীয়মান বহু মুসলিম লেখক-লেখিকা, কবি-সাহিত্যিকের জন্মদাতা এ কথা সবাই স্বীকার করে। চুরানব্বই বছরের এ বয়োবৃদ্ধ সাংবাদিক, জ্ঞানতাপসের স্মৃতির মনি কোঠায় এখনও লুকিয়ে আছে প্রায় শতাব্দীর ইতিহাস। তার বাড়ীর (৩৮নং শরৎ গুপ্ত রোড) নিজস্ব পাঠাগার থেকে কিছু কিছু লেখা উদ্ধার করা গেল। তারই নির্দেশে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগে। অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেবের বিভাগ থেকে জানলায় সাপ্তাহিক সওগাতের কয়েকটি সংখ্যা

সংরক্ষিত আছে সিলেটের আল্ ইসলাহ পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ নূরুল হক সাহেবের সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগারে। শেষ পর্যন্ত সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। তাই যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাই দিয়ে এ ক্ষুদ্র সংকলন। কিন্তু অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরো অনেক লেখা অজ্ঞাতেই রয়ে গেছে।

এ সংকলনে চারটি অধ্যায়,—প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও কয়েকটি চিঠি। প্রত্যেক বিভাগের পূর্বে সামান্য ভূমিকা রয়েছে। লেখা সম্পর্কে সামগ্রিক-ভাবে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনাতেই তা পরিস্ফুট। তবু দু' চারটি কথা নিবেদন করছি।

*

প্রবন্ধগুলির বেশীর ভাগই মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা সম্পর্কিত। ইসলামে সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান, পর্দা ও অবরোধ, সাহিত্য সাধনা, সর্বশেষে মায়েদের শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিস্ময়কর সমাজ সচেতনতা ও নারীদের দুরবস্থায় তিনি পথের দিশা দেখাবার জন্য অতীত ইতিহাসের অনেক উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন। নারীর অধিকার সম্পর্কে কোরান হাদিসের উধৃতি দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে প্রথম প্রবন্ধ 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাদের শিক্ষার ধারা'য় নারী শিক্ষার করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই বলে, 'কলিকাতার প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়ে ছাড়া বাসিন্দা মেয়েদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা নাই। মফস্বলেও বিশুদ্ধ বানানে চিঠিপত্র লিখতে পারে এরূপ মেয়ে পাওয়া দুরূহ।' করুণ সে চিত্র।

মেয়েদের শিক্ষাসূচী সম্পর্কেও ইংগিত দিয়েছেন, 'বিশুদ্ধ কোরান শরীফ পাঠ, মোটামুটি উর্দু ও বাংলা ভাল বই বুঝিয়া পড়িবার শক্তি, দেশ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান, ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজগণের ইতিহাস, ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও জমা খরচ রাখার মত অঙ্ক জানিলেই যথেষ্ট।' চমৎকার পাঠ্যসূচী নয় কি?

মুসলমান সমাজের 'পর্দা ও অবরোধ সম্পর্কে তার বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। বলেছেন, 'পর্দা নারীর শুচিতা ও চক্ষু লজ্জা, নারীর স্বাতন্ত্র ও পবিত্রতা। বাহিরের অশুচি স্পর্শ হতে, শয়তানের পাপচক্ষু হতে পরিত্রাণের জন্য নারীর একটু আবরণ প্রয়োজন, সে আবরণ পর্দা অর্থাৎ বোরকা। অবরোধ ভাঙ্গতে গিয়ে মহান গুরু ও আদর্শ পথপ্রদর্শক রসুলের উপদেশ অবজ্ঞা করে আল্লাহ-তালার অনভিপ্রেত কার্য দ্বারা তার অভিশম্পাত শিরে ধারণ করে পরম উপকারী পর্দাও ছিন্ন করে ফেলতেছি।'

জাতি ও দেশের উন্নতি ও প্রগতির মূলে নারী শিক্ষার কথা তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে বলেছেন। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 'মায়ের শিক্ষা, প্রবন্ধে বলেছেন—

'অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাতৃত্বের কবলে পড়িয়া শিশু ও বালকদের মন ও প্রাণের ভীষণ অপচয় ঘটিতেছে। এটা সমাজের পক্ষে একটা মহা বিপদস্বরূপ। মায়ের মূর্খতাই সন্তানে অক্ষয় হইয়া রহিল। সমাজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল মায়ের অশিক্ষা। এ জন্যেই কন্যার শিক্ষা পুত্রের শিক্ষার চেয়ে সমাজ মঙ্গলের দিক থেকে বেশী দরকারী। পুত্রের মত কন্যারও বরং পুত্রের চেয়ে কন্যারই বেশী সুশিক্ষা হওয়া প্রয়োজন এবং সমাজ মঙ্গলের রচয়িতা রূপেই তাহার শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। মা যদি শিক্ষিতা ও সুবুদ্ধিসম্পন্না হয়, শিক্ষা ও সুবুদ্ধির ছোঁয়াচ মাতৃস্তনের সংগে সংগেই সন্তানের রক্তের অনুতে প্রবেশ করিবে।...সন্তানের কাছে সে (মা) হইবে কল্যাণের উৎস।...পাঠশালা যাইবার পুর্বে অভ্যাস ও পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে চমৎকার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে।'

ইসলামে নারীর স্থান প্রবন্ধে লেখিকা অন্য ধর্মাবলম্বী নারীদের ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদার সংগে তুলনা করে ইসলামে নারীর শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে

সব সমস্যা দেখা দেয় তা হল, বিবাহ, তালাক ও নারীর অধিকার। এ সম্পর্কে কোরান হাদিসের ভিত্তিতে যে বিবরণ ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা তার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। শেষে বলেছেন, 'নারীর প্রকৃত মর্যাদা ইসলামের মত অন্য কোন ধর্ম কোনদিনই স্বীকার করেনি।...ধূলিবিমলিন কৃতদাসীর পর্যায় হতে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান পর্যায়েই টেনে তুলেছেন।' চমৎকার প্রকাশ নয় কি ?

*

বাংলার পল্লীর কৃষিজীবীদের—বিশেষ করে মুসলমানদের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃসহ জীবন সমস্যা সম্পর্কে লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ উক্তি ও পথনির্দেশনার অমোঘ বাণী জাতীয়তাবোধের এক অনন্য উদাহরণ। 'জাতীয় জীবন সমস্যা' প্রবন্ধে উল্লেখিত উক্তিগুলি তার চিন্তাধারার অপূর্ব প্রকাশ। বলেছেন—

> 'জীবিকা নির্বাহের অন্য পথ না থাকায় কৃষিই বাঙ্গালী মুসলমানের একমাত্র অবলম্বন। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির মধ্যে কৃষি মহা-সম্মিলনী হইতে কোন্ জিনিষের কতটা প্রয়োজন ও কোন্ জমিতে কি উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহা কৃষকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশে তদনুরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। যাহার ঘরে অন্ন নাই, মাতা ভগিনী উপবাসক্লিষ্ট, সে দেশের কাজ করিবে কিরূপে ? সমস্ত লোকগুলি আফিংখোরের ন্যায় ঝিমাইতেছে ও মরিতেছে। কিন্তু কেহ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেনা। ইহার প্রতিকার নাই। এই অসারতা ও নির্জীবতার একমাত্র ঔষধ সুশিক্ষা। যে মুহূর্তে দেশের লোক প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই নেশা ছুটিবে।...সর্বাগ্রে মুসলমান সমাজের শিক্ষার বন্দোবস্ত করাই সকলের সর্বপ্রধান কর্তব্য।'

তিপ্পান্ন বছর আগেকার (১৩৩৫) লেখিকার এ আবেদন আজ (১৩৮৮) গণ শিক্ষার আন্দোলন রূপে জনমনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার করেছে।

*

কবিতার সংখ্যা ১৮। তন্মধ্যে 'চাষা'ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কবিতাগুলির আবেদনে আছে পারিপার্শ্বিক জীবন ধারা, নিঃপীড়িতের ক্রন্দন, প্রকৃতির রূপ, আধ্যাত্মিকতার আকুল আকুতি।

১৯৩৬ সালে কুমিল্লায় জনাব এ, কে, ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেলা কৃষক কনফারেন্সের উদ্বোধনী সংগীতটি ছিল রাজিয়া খাতুনের লেখা।—

মরণ সাগর কূলে বসে
গাহি জীবনের জয় গান।
মরণের পথে বেঁচে আছে যারা
তাহাদেরই এ অভিযান॥

কবিতাটির জন্মইতিহাসও স্মরণীয়। একদিন স্বামী আশরাফউদ্‌দীন আহমদ চৌধুরী বাহির থেকে এসে রোগশয্যায় শায়িতা কবি-স্ত্রীকে বললেন 'নয়া বাংলা'র জন্য একটা বাণী লিখে দিতে। বাণীময় ঐ কবিতাটি।

সত্য ও মনুষ্যত্বের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন কবি—

সত্য সাধনা সকলের মাঝে
জাগায়ে তুলিতে হবে
মরণের ছায়া দূরে চলে যাবে
জীবনের জয় জয় রবে।

... ...

মনুষ্যত্ব চিরসত্য
সে যে চির অক্ষয়
তাহার খর্ব করিতে যে চায়
তারই মর্যাদা হইবে ক্ষয়॥

কবি আত্মার পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে নিজকে সমর্পণ করেছেন প্রভুর নিকট—

হে মোর প্রিয়, হে মোর প্রভু তোমারি হউক জয়
তোমারি মাঝে ভুলাও আমায় আমিত্ব হোক ক্ষয় !

কবিতা লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কাব্যসাগরে ডুব দিয়ে মণি মুক্তাও আহরণ করেছেন। তখনো তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি ওম খৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদ করে বাংলায় উপহার দিয়েছেন। অনব সুন্দর দু'টি পংক্তি—

কুঞ্জ বিতানে গুঞ্জনভরা প্রহর যাইবে কাটি
এ মধু বসন্ত, ওগো সাকী আজ করোনা করোনা মাটি।

*

গল্প কল্প কাহিনী হলেও সমাজ জীবনের বাস্তবতার চেয়ে বেশী ভয়ংকর যুগে যুগে গল্পকারেরা তাদের কাহিনীতে মানব চরিত্রের বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন, পাঠকের উপভোগ্য করেছেন। এ শতকের প্রথমাংশে লেখ রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর গল্পগুলি ছোট গল্পের বৈশিষ্টে সমুন্নত। জীবিত কালে প্রকাশিত সাতটি গল্পের সংকলন 'পথের কাহিনী' দুষ্প্রাপ্য বিধা তিনটি গল্প এ সংকলনে সংযোজন করা যায়নি। গল্পগুলিতে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ছাড়াও রয়েছে সামাজিক ও মানবিক সমস্যা, হাস্যরস এব সাম্প্রদায়িকতার দুষ্টক্ষতের চিত্র। সবই দশটি গল্পের স্বল্প পরিসরে দৃষ্ট হয়।

'ঈদের চাঁদে' দেখা যায় মুমূর্ষু পুত্রের পাশে সম্ভ্রান্ত বংশের দারি প্রপীড়িত মা। ঘরে চাল বাড়ন্ত। 'কি খেয়েছে'—ছেলের এই প্রশ্নের জবাবে বলল, 'দু'টি মুড়ি ছিল তাই খেয়েছি।' মৃত্যুকাতর পুত্র আত্মীয়ের শঠতা নিঃস্ব কাঙ্গাল মায়ের অন্তরের বেদনা অনুভব করে বলেছেন, 'সে দিন আসবেন আম্মা, গরীব কোনদিন বড় লোকের কাছে আত্মীয়তার দাবী করবে

পারবেনা,—যদি গায়ে জোর না থাকে।' ঘটনা এই,—জমিদার বাড়ীর বউ। স্বামীর মৃত্যুর পর বাকী খাজানার ফাঁকির কৌশলে সম্পত্তি নিলামে আত্মসাৎ করে বাড়ীর বাইরে কুটিরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দেবর। প্রাংগণের পাশে প্রাচুর্যের মহড়া আর ওপাশে দারিদ্রের করুণ আর্তনাদ। পাশাপাশি এ দু'টি পরিবার একই বংশদ্ভুত। লেখিকার প্রশ্ন—'কেউ পোলাও কোর্মা নর্দমায় ফেলে দেয়, কেউবা তিনদিনেও খেতে পায়না কেন?…হাঁ, খুব সত্যি কথাইতো, টাকার চাপে কতকগুলি লোক হাঁপিয়ে উঠেছে। অথচ তাদের চোখের সামনে অসংখ্য প্রাণী, হা অন্ন, হা বস্ত্র বলে কবরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে।' মানব সমাজে এ দুষ্ট প্রবাহ অব্যাহতভাবে চলেছে। না, নৈতিক অবক্ষয়তার জন্য বরং তা শতগুণে বেড়েছে।

*

রাজিয়া খাতুন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক স্বামী চৌধুরী সাহেবের সংগে থেকে মুসলিম বিদ্বেষী কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীদের মনমানসিকতা ও হীন ষড়যন্ত্রের যে পরিচয় পেয়েছেন তা অকুতোভয়ে দৃঢ়চিত্তে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন 'শ্রমিক' গল্পে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। দেশপ্রেমের বুলি সবার মুখে। রেল ধর্মঘট চলছে। কংগ্রেসনেতা বিশ্বনাথ মিত্র রেল কর্মচারী তাহেরকে বলছে, 'বারবার বলছি, তোমার কানেই যায় না। তোমায় ১৫ দিন সময় দিলাম। এরমধ্যে যদি চাকুরী না ছাড় তবে তোমার ধোপা, নাপিত, এমন কি বাজার হাটও বন্ধ করা হবে।' তাহের সাহস করিয়া কহিল, 'আমার প্রাণ দিলে যদি দেশের উপকার হয় তাও দিতে পারি। কিন্তু পাঁচটি প্রাণ নিয়ে কি হবে?' নরেশও রেলকর্মী। বিশ্বনাথ মিত্রের ভাই পো। তাকে কিন্তু চাকুরী ছাড়তে বলা হচ্ছেনা। দুঃখ করে তাহের বলছে 'হিন্দুরা দিব্বি চাকরী করছে। যত দোষ আমাদের বেলা।- কথায় কথায় স্বদেশী আন্দোলনের উদাহরণ দেয়। আমরা নাকি

দেশের জন্য কিছুই করিনা ।' 'এ রকম যে ওরা আরো কতজনকে মজিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই ।' যে রকম অবস্থা—তাতে পথে চলাই দায়। কংগ্রেসী ভলানটিয়ার ও নেতারা পথে ঘাটে অপমান আরম্ভ করেছে।' তাদের বেপরোয়া হয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'নরেশ মিত্রকে চাকুরী ছাড়তে বলেন না কেন ?' এবার বজ্রপাত। চাকুরী খতম। বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সে বাসাখানা নরেশকে দেয়া হল। ব্যাস ! দেশপ্রেম ! চমৎকার দেশপ্রেম !! রাজিয়া খাতুন আরো লিখেছেন 'সন্ধ্যায় 'স্থানীয় এক নেতার গৃহে কর্মীবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন। একজন চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া বলিলেন, 'আরে, সে তাদের চাচা যে ভেগেছে জান ?' আর একজন সজোরে টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'তাই নাকি ? তা বেটাকে বহুকষ্টে বাগে আনতে হয়েছে।' একজন নতুন কর্মী বলিল, "আজ সকালে ওর বড় ছেলেটি মারা গেছে, বেচারা চারিটি প্রাণের আহার যে কোথা থেকে জোগাবে, আল্লাই জানেন, কংগ্রেস ফণ্ড থেকে কিছু দিলে হতনা ?' মিত্র মহাশয় তর্জনী হেলাইয়া বলিলেন, 'রেখে দাও তোমার চালাকি।'

*

দারিদ্রের কঠোর কঠিন নিষ্পেষণে মানবাত্মা মরে যায়। অনাহারক্লিষ্ট মানবাত্মা অন্নের তল্লাসে আত্মাহুতি দেয়। সন্তান সন্ততির ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণার্থে চুরি করে। এ দৃষ্টান্ত সব যুগের, সব দারিদ্রপীড়িত জনগণের। অপরাধ জেনেও মরণ থেকে বাঁচার জন্য অন্যায় করে। ওখানেও অন্যদিকে চাকর চাকরাণীর আশ্রয়ী মহাপ্রাণরা মিথ্যার ছলে চরিত্রবান (?) অপরাধীকে সাধু বলে আখ্যায়িত করে তাদের ইজ্জত রক্ষা করে। তারই কাহিনী রয়েছে 'এ মরু কারবালায়।' বাড়ীতে জেয়াফত। অঢেল খানাপিনা। বিশ বছরের বিশ্বস্তা চাকরাণী জরিনা। মৃত ভাইয়ের উপবাসী সন্তানদের জন্য দু'মুঠো ভাত চেয়েও বঞ্চিত। তখন ভাবে, 'আচ্ছা, আমিত দিনরাত শরীর

খাটাই এখন যদি এখান হতে (রান্নাঘর) দু'মুঠো তুলে নিয়ে উপবাসী বাচ্চা দু'টাকে খাওয়াই, খুব বেশী দোষ হবে কি?' ধরা পড়ে নাকে খত দেয়ার শাস্তির কথা শুনে সবাইকে অবাক করে মাতৃসমা গৃহিণী ভান করে বলেছিল, 'টেপার মা, সকলকে বল আমি পাঠিয়েছিলাম ওকে পোলাও নিতে।' এমনি করেই গৃহিণী বাঁচালেন জরিনাকে অপমানের হাত থেকে। বড় রাঁধুনী টেপার মা কিন্তু তাতে খুশী হয়নি।

*

কলকাতায় তখন ইংরেজী শিক্ষিত যুবসমাজ আধুনিকতার মোহে অন্ধ হয়ে বিদেশী সভ্যতার অনুকরণে শুধু নিজেরাই নৈশক্লাবে যোগদান করে সুরা সাকীদের সান্নিধ্য উপভোগে মত্ত হয়নি, নারীধর্মে নিষ্ঠাবতী সতী সাধ্বী স্ত্রীদেরও টেনে নিয়ে সমাজের নতুন উচুস্তরে উঠার প্রয়াসী হয়েছে। তাতে সলজ্জ শালীন গৃহবধূ স্বামীর অহমিকার শিকার হয়ে আবিলতার স্রোতে ভেসে গিয়ে আত্মমর্যাদা রাখতে পরাশ্রয়ী হয়েছে। এমন উদাহরণের অভাব নেই। 'নারীর ধর্ম' গল্পে লেখিকা তাই পেশ করে সাবধানী দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

'তোমার রূপের দ্বারে অতিথি সুন্দরী! নিরাশ করোনা মোরে।' মদ্যপায়ী মাতাল কমিশনার বলছে অধঃস্তন কর্মচারী লতিফের স্ত্রী সুন্দরী রওশনকে। তাকে ঝাপ্টে ধরতে উদ্যত। লতিফের বন্ধু মাহবুব প্রবল ধাক্কায় সরিয়ে দিল কমিশনারকে। ঘটনার হল বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যা, করুণ পরিণতি। কমিশনার বলল, 'অমন স্ত্রীকে কিন্তু ত্যাগ করা উচিত।' সন্দিগ্ধ লতিফ। কুইংগিতটা মাহবুবের প্রতি।...'একটু পরে লতিফ এগিয়ে এসে তার হাতে দু'খানা কাগজ দিয়ে বলল, 'এই নাও—তোমাকে দিলেই চলবে বোধ হয়।' সেগুলি না দেখেই মাহবুব বললে, 'তোমার ঘরে চল, সব ঘটনা বলছি।' 'কিছু শুনতে চাইনে' বলে লতিফ বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত

মাহবুব কাগজগুলি খুলে দেখে একখানা তালাকনামা ও একখানা মোহরানা বাবদ বিশ হাজার টাকার চেক।' এইতো সস্ত্রীক ক্লাব জীবনের অবাঞ্ছিত পরিণতি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এ অনুপ্রবেশ সমাজ জীবনকে প্রগতি তথা নব অধোগতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে যার সচিত্র প্রতিবেদন রেখে গেছেন রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী ১৩৩৬ সালে।

*

চিঠিও এক রকম সাহিত্য। মাত্র চারখানা এখানে সন্নিবেশিত। এখানে রয়েছে তার বার বছর থেকে লেখার ইতিবৃত্ত। চিঠিগুলিতে পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য ছাড়াও কিছু সাহিত্য সংবাদ আছে, যেমন 'পরশু সওগাত দিয়েছি। গল্প বা বেরোয়, রাবিশ।' শরীফার পঞ্চম বিয়ে সম্পর্কে টিপ্পনি, 'আমার মনে হল 'শেষ প্রশ্নের কমলে'র কথা।' অন্যদিকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষা দেয়া হবে বিবাহের উদ্দেশ্য ও পবিত্রতা। ধর্মের চক্ষে বিবাহ নীতি ইত্যাদি অথচ এ দেশে আরম্ভ হয়েছে 'বিবাহের চেয়ে বড়' নাম দিয়ে উপন্যাস লেখা।' সাহিত্য চিঠিতেও।

*

সুসাহিতিক মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ১৩৮৩ সালের ৮ই ফাল্গুন দৈনিক ইত্তেফাকে। নাম 'কবি ও কথাশিল্পী রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী।' লিখেছেন 'কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা কুসুম কুমারী দাসীর একটি কবিতার কয়েকটি পংতি প্রায় প্রবাদে পরিণত :

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

এই কবিতাটি ছিল এককালে অধিকাংশ স্কুল পাঠ্য বইয়েরই অন্তর্গত। আরেক জন মহিলা কবির ······ রাজিয়া খাতুনের 'চাষা' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।

এই বিখ্যাত কবিতাটির এসব পংক্তি এখনও বহু মানুষের মুখস্থ, অনেকের স্মৃতিতে গুঞ্জরিত, ··· স্কুল পাঠ্য বইয়ের অন্তর্গত।

... ...

'রাজিয়া খাতুন শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ছোট গল্প লেখিকা, প্রবন্ধকার ও অনুবাদিকা।

'রাজিয়া খাতুন অধুনা বিস্মৃত হলেও, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ছিলেন সুপরিচিত ও আলোচিত লেখিকা। সাপ্তাহিক সওগাত, মাসিক সওগাত, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, নওরোজ, নয়া বাংলা ইত্যাদি বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা ছড়িয়ে আছে। 'পথের কাহিনী' নামে তাঁর একটি গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'উপহার' ছাড়া সম্ভবতঃ তাঁর অন্য কোন কাব্যগ্রন্থ এবং প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়নি ; প্রকাশিত হয়নি অনুবাদ কবিতার কোন সংকলনও।

... ...

'তাঁর গল্প আকারে ছোট, প্রকারে ও চারিত্র্যে ছোটগল্পধর্মী এবং বিষয়-বস্তুর দিক থেকে বাস্তবনিষ্ঠ ও জীবনানুগ। চাষী, কৃষক-শ্রমিক ও মুটে-মজুরের প্রতি ছিল রাজিয়া খাতুনের সুগভীর মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধের পরিচয় আছে তাঁর কবিতায়, ছোটগল্পে এবং প্রবন্ধে। ভাষা সহজ-সাবলীল ও গতিময়।

... ...

'বিদেশী শাসনামলে আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী অত্যন্ত সহজ-সাবলীল ও স্বচ্ছ ভাষায় বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষির বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছিলেন।

... .

'রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর আগে কোন মুসলিম-লেখিকা এদেশের কৃষক ও কৃষির সমস্যা সম্পর্কে এমন ব্যাপক ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা বলা কঠিন।

... ...

'রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী শুধু চাষীদের সমস্যার কথাই ভাবেননি, তিনি গ্রাম-জীবনে, বিশেষ করে মুসলমান সমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাব এবং কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার ব্যাপকতার কথাও ভেবেছেন। তিনি 'জাতীয়-জীবন সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধেই লিখেছেন: "সরকারী ও বেসরকারী অনেক পাঠশালা-মক্তব-মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। আমাদের যে শিক্ষার আবশ্যক ইহা কি সেই শিক্ষা? এই শিক্ষার দ্বারাই কি আমাদের মন ইসলামের উন্নত ও মহান আদর্শে গঠিত হয়? মনের সৎবৃত্তি সকল পরিস্ফুট ও মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয় কি? সমাজের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-দৈন্যের স্বরূপ বুঝিতে এবং তাহার প্রতিকার করিতে পারে কি? মুখে যতই শিক্ষার গর্ব ও আস্ফালন করি না কেন, মন বলিয়া দেয়—'না'।"

'আমাদের শিক্ষার এই সমস্যা বলতে গেলে আজও একরূপ অপরিবর্তিত। একালে আদর্শ ও মূল্যবোধভিত্তিক, বাস্তবানুগ এবং কার্যকরী ও উপযোগিতামূলক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী পঞ্চাশ বছর আগেই অনুরূপ শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনার মূল্য এখনও অপরিসীম।'

আমার আম্মাকে যতটুকু জেনেছি

জীবন বহমান। প্রতিদিন পিছনে ফেলে যায় একটি করে দিন; পার হয়ে যায় অনেক মাস, অনেক বছর, অনেক যুগ। স্মরণের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় অনেক স্মৃতি—যার কিছু তিক্ত, কিছু মধুর, কিছু বেদনার, কিছু আনন্দের, কিছু গৌরবের, কিছু বা শুধুই অবহেলার। স্মৃতিচারণের মুহূর্তে বিচিত্র সব অনুভূতি দোলা দিয়ে যায় হৃদয়কে বিভিন্ন রূপ নিয়ে।

যাঁর কথা লিখব বলে আজ সবচেয়ে সচেতন, সাবধানী মন নিয়ে বসেছি তাঁরই স্মৃতি সবচেয়ে অস্পষ্ট আমার মনোজগতে। এক অবোধ বালিকার স্মৃতিতে তিনি শুধুই একটিমাত্র ধূসর সন্ধ্যা অথবা প্রভাতের নায়িকা। আতর, গোলাপ ও লোবানের সুগন্ধি রূপকে শুভ্র শ্বেত-বস্ত্রে আবৃত এক নিস্পন্দ মূর্তি, যাকে ঘিরে চলেছিল আত্মীয় পরিজনের শোকের বিলাপ, চলেছিল বহুজনের আনাগোনা। আজও আমি বুঝতে পারিনা সেই দৃশ্যের দর্শক কি আমি সত্যিই ছিলাম, অথবা আমার উৎসুক কল্পনাই নিরন্তর আমার সামনে উপস্থিত করে ঐ ছায়াছবির মিছিল?

আমার প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁর সম্বন্ধে শুধুমাত্র ঐ টুকুই, তাঁর কথা লিখতে আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে অন্যের মুখে সোনা ঘটনাবলী, তাঁর রচনাবলী ও পত্রাবলীর উপর। সবচেয়ে বেশী যাঁর কাছে শোনা, যিনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ, তিনিও আজ এ মরজগতে অনুপস্থিত। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্নেহময় 'বাবা'। উপ-মহাদেশের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব মরহুম আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

দেশবরণ্য রাজনৈতিক নেতা আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত সৎ সাহসী, নীতিনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, তবুও কুমিল্লার যে যুগের এক প্রতাপশালী

জমিদার বংশের প্রতিভূ হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রেই যিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তপ্ত মেজাজের অধিকারী! রাজিয়া খাতুনের কোমল মধুর অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বপূর্ণ সংস্পর্শ তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। তাঁরই মুখের কথা, "তোমাদের আম্মা আমাকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত করেছিলেন।" রাজিয়া খাতুনের জন্ম ১৩১৪ সনের ৩রা চৈত্র। তিনি পরিণীতা হন ১৩৩১ সনের ১৮ই বৈশাখ। পিতৃগৃহের এই স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় তাঁর কিছুটা কেটেছে জ্ঞানার্জনের সাধনায়, কিছুটা কেটেছে সাহিত্য সাধনায়। বার বৎসর বয়স থেকেই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রয়াস। যার ইতি হয়েছিল তাঁর অকাল মৃত্যুতে ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে।

তিনি কোন বিদ্যালয় বা উচ্চ-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের অবকাশ পাননি। তাঁর শিক্ষার সুযোগ ছিল গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। শৈশবে প্রথম হাতে খড়ি তাঁর জন্মস্থান নোয়াখালীর বাড়ীর মসজিদের ইমাম জনাব মাওলানা ওমর সাহেবের কাছে। এরপর এগিয়ে চলে তাঁর জ্ঞানার্জনের সাধনা তার আপন আগ্রহে। কিছুদিন তাঁর এক নানা মোহাম্মদ মছউদ সাহেবের কাছে, কিছুদিন তাঁর বড় মামা মরহুম মোঃ আবদুল কুদ্দুস সাহেবের (প্রখ্যাত শিল্পী কাইউম চৌধুরীর আব্বা) কাছে, পরে গৃহ শিক্ষকের কাছে। বাংলা, ইংরাজী আরবী ও ফারসী এই চারটি ভাষায় তাঁর মোটামুটি দখল ছিল এ কথা জানা যায়। রাজিয়া খাতুনের পিতা মরহুম হাজী আবদুর রশিদ খান ছিলেন, সে যুগের একজন স্বরাজ্য পার্টির এবং অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিভিন্ন সময়ে তিনি নোয়াখালী পৌরসভার সদস্য ও সহ-সভাপতি, জেলা বোর্ডের সদস্য, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও নোয়াখালী হ'তে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দেশবন্ধু তাঁহাকে কর্পোরেশনের ডেপুটি

এক্সিকিউটিভ্‌ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেন। তাঁর ঐ কার্যকাল তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন।

রাজিয়া খাতুনের মাতা মরহুমা হাজেরা খানম ছিলেন প্রখর প্রজ্ঞা-শালিনী ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর খুব বেশী ছিলনা তবু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁর সে অভাব অত্যন্ত সহজেই পূরণ করে। যে কোন ব্যাপারে তাঁকে যোগ্যতার আসন দিত। জননীর অবদান রাজিয়া খাতুনের জীবনে ছিল অপরিসীম, একথার স্বীকৃতি তাঁর রচনায় আছে।

এক যুগেরও কম বিবাহিত জীবনে রাজিয়া খাতুন তাঁর মধুর স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের যে প্রভাব স্বামীগৃহে রেখে গেছেন, তাঁর জীবনাবসানের বহু বছর পরেও আমরা যখন কিছুটা বড় হয়েছি বহুজনকে বহুবার শুনেছি সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে।

কলিকাতা প্রবাসী মোটামুটি ধনবান পরিবারের আদরিণী প্রথমা কন্যা মাত্র ষোল বৎসর বয়সে বিবাহিতা হয়ে এসে শুয়াগাজীর মত তৎকালীন গণ্ড গ্রামে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অত্যন্ত গোঁড়া জমিদার পরিবারে নিজের আসন যেভাবে অনায়াসে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা আজও ভাবলে বিস্মিত হতে হয়! শাশুড়ী থেকে ভাশুর, জা, দেওর, ননদ এবং আশ্রিত পরিজন, প্রতিবেশী ও অগুণতি দাস-দাসী সকলেই ছিল তাঁর গুণে মুগ্ধ, অনুগত। একথা অনেকের মুখেই—বিশেষ করে বাবার কাছে বহুবার শুনেছি। সেদিনের এক ষোড়শী বধূর জন্য সে যে কি সাফল্য ছিল আজ তা উপলব্ধি করা কঠিন।

রন্ধন বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল না। যা ছিল আমাদের পরিবারের একচেটিয়া গুণ। বাবা প্রায়ই কৌতুকের সঙ্গে বলতেন, "সেই কমজানা বিদ্যা নিয়েই সে প্রায়ই উৎসাহের সঙ্গে রান্নায় লেগে যেত এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খাওয়াতে ভালবাসত।" বৃদ্ধা শাশুড়ীর দৈনন্দিন সেবা, দেওর ননদদের আদর যত্ন, দাস-দাসীর সঙ্গে অত্যন্ত সদ-ব্যবহার, যা নাকি সে যুগের জমিদার বাড়ীতে ছিল দুর্লভ, এগুলি ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

আমার বড় চাচা মরহুম ওমর আহমদ চৌধুরী সে যুগে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও রাসভারী জমিদার রূপে খ্যাত ছিলেন। তিনিও 'আম্মার' স্বভাব মাধুর্যে তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু তাঁকে আপন সহোদরার বিয়োগ ব্যথার মতই শোকাভিভূত করেছিল। স্বামীগৃহে, বিশেষ করে স্বামী যখন প্রায়ই থাকতেন বৃটিশের কারাগারে রাজিয়া খাতুন আপন কর্তব্যকর্ম, তথা—সন্তানদের সেবা যত্ন, সংসার দেখাশোনা, বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা যত্ন ও অন্যান্য সামাজিক কর্তব্য পালনের ফাঁকে ফাঁকে আপন সাহিত্য সাধনায় সব সময়ই নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। পড়াশুনা করার নিয়মিত অভ্যাস ছিল তাঁর। দিনে অবসরের অভাব হলে রাত্রি জেগেও তিনি পড়াশুনা করতেন। দৈনিক পত্রিকা থেকে শুরু করে সাপ্তাহিক, মাসিক, সাহিত্য সাময়িকী, যা তিনি সংগ্রহ করতে পারতেন। সব কিছুই বিনা পক্ষপাতিত্বে গলাধকরণ করতেন; যা কিনা সে যুগের একজন পর্দানশীন মুসলিম মহিলার জন্য বিরল দৃষ্টান্ত! বাবার কথায়, "তোমাদের আম্মার বিছানার চারপাশে বইখাতার স্তূপ জমতে জমতে শেষে মাটিতে পাহাড় হয়ে থাকত। আমি হঠাৎ এসে পড়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে তাড়াতাড়ি কিছুটা গোছগাছ করে রাখত।" সংসারের কাজকর্ম, রান্না অথবা অন্য কিছু করতে করতে হঠাৎ হয়তো কোন কবিতা বা লেখা মনে এসে গেল, সব কিছু ফেলে ছুটে যেতেন খোলা খাতাটির কাছে, সেই মুহূর্তে কলম নিয়ে লিখতে বসে যেতেন। এ গল্প শুনেছি তাঁর বড় 'জা', আমার বড় চাচি আম্মার মুখে। যিনি নাকি এ দৃশ্যের প্রতিনিয়ত দর্শক ছিলেন।

আজকের আশির দশকে আমরা গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্যাপক প্রয়াস চালাচ্ছি নিরক্ষরতা দূর করার জন্য। যিনি সেই ১৯২৫-৩০ সনে পিতৃগৃহ ঢাকার আজিজপুরে অথবা পরে স্বামীগৃহ গুয়াগাছী গ্রামে বাড়ীর এবং আশেপাশের নিরক্ষর মহিলা এবং বালিকাদের নিয়ে রীতিমত ক্লাশ করে গণশিক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর পত্রাবলীতে

দেখেছি এ ব্যাপারে উল্লেখ এবং বাবার কাছেও শুনেছি এ ব্যাপারে তাঁর অপরিসীম উৎসাহের কথা। তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্তা আশেপাশের বাড়ীর কিছু মহিলা আজও বলে থাকেন সে কথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে।

এই সমস্ত সমাজ সেবা-মূলক কাজে ছিলনা তাঁর কোন পরামর্শদাতা। 'আপন মনের মাধুরী' সদিচ্ছা এবং দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী স্বামী ও পিতার আদর্শই হয়তো তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যদিও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীর সহধর্ম্মিনী হিসাবে নিজেকে তিনি এক গৌরবময় মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তবুও, দেশ সেবায় নিবেদিতপ্রাণ নিরন্তর কারাপ্রবাসী স্বামীর অভাবে তাঁর 'ঘর' কখনও পূর্ণতার মহিমায় বিকশিত হতে পারেনি। 'ভাঙ্গাঘরের' বেদনা বোধ ছিল তাঁর অপরিসীম। তাঁর সাহিত্য কর্মে রয়ে গেছে তার চিহ্ন।

'আম্মা'র ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমার সংগ্রহের ঝুলি অত্যন্তই ছোট, কিছু কথা এখানে রাখলাম খুবই সন্তর্পণে, অন্তরে ভয় নিয়ে—স্মৃতি চারণে মিথ্যা চারণের খাদ না মিশে যায়। যে তথ্য সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা থেকেই সংগৃহীত তাই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। ব্যক্তি প্রসঙ্গের এখানেই শেষ করছি অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, সবকিছুই অকথিত রয়ে গেল, বলা হোল না বোধ হয় কিছুই।

আমি সাহিত্যিক বা সমালোচক নই, সে দৃষ্টিতেও রাজিয়া খাতুনকে আমি দেখিনি, তবুও আজকের একজন নগণ্য সমাজসেবিকা হিসাবে বক্তব্য রাখার কিছুটা দায় আমি অনুভব করছি।

আগেই বলেছি, সমালোচকের দৃষ্টিতে আমি তাঁর সাহিত্যকর্মকে দেখিনি। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে আমি দেখেছি এক মননশীলা তেজস্বিনী অথচ কোমল স্বভাবা মহিলাকে, যাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব প্রভাবান্বিত করেছিল তাঁর সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিকতাকে। আমি দেখেছি এক মমতাময়ী স্পর্শ-কাতর নারীকে, তৎকালীন মুসলিম সমাজের অবহেলিতা, নির্যাতিতা মহিলাদের দুঃখ-বেদনায়

যিনি ছিলেন সোচ্চার। তাঁর গল্প-প্রবন্ধে আমি দেখেছি এক সমাজ-সংস্কারিকার প্রতিবাদী কণ্ঠ! তাঁর কবিতায় শুনতে পেয়েছি এক বিদ্রোহিনী অথচ সৃষ্টিকর্তার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণা দার্শনিকের কণ্ঠস্বর! সর্বোপরি দেখেছি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠী "আমার দেশের চাষা"র চারণকবি রাজিয়া খাতুনকে। দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে যাদের কথা তিনি তাঁর রচনাবলীর বহুস্থানে বার বার বলে গেছেন! আমি আশ্চর্য হয়েছি! অভিভূত হয়েছি তাঁর দূরদৃষ্টি, তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায়। তাঁর অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ (যেটা আমরা চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে পারিনি) "জাতীয় জীবন সমস্যা"য় তিনি যেভাবে ছোট ছোট কথায় দেশের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন, পরাধীনতার অক্ষমতায় তার সমাধানের ব্যর্থতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন— চারযুগ পরে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও আমাদের সমস্যার মূলগুলো রয়ে গেছে তাঁরই চিহ্নিত বলয়ের মাঝে!

আজ বিরাশি সনে আমরা যখন জাতীয় উন্নয়নের কথা বলছি। স্বীকার করছি—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নিহিত আছে এদেশের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী কৃষক-কুলের উন্নয়নে; কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে, তখন কি একবারও মনে করব না সেই মহিলার কথা, পঞ্চাশ বছর আগে যার কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হয়েছিল এই কথাগুলো? কণ্ঠ তাঁর ক্ষীণ হলেও বক্তব্য কি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সত্য ছিল না?

বাংলাদেশের মহিলা সমাজের জন্য সর্বপ্রথম সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন নির্দিষ্ট করে ছন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। জাতীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নারী সমাজকে তিনি করেছেন সহযাত্রিনী! তাঁর চোখ দিয়েই আমরা দেখতে শিখেছি দেশে-সমাজে আমাদের সঠিক অবস্থান! সংগ্রাম করছি সে অবস্থানকে সুদৃঢ় করার প্রয়াসে! পঞ্চাশ বছর আগে রাজিয়া খাতুনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, "নারীকে শক্তিময়ী হইতে হইবে। নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নারীকে মুক্ত আলো হাওয়ায় বাঁচিতে

হইবে। সুশিক্ষা লাভ করিতে হইবে।" তাঁর কণ্ঠে শুনি প্রশ্ন, "নারী অপেক্ষা পুরুষের মর্যাদা অধিক, ইহার কারণ কি? বিদ্যা-বুদ্ধি, রূপ গুণে, সমভাবে শিক্ষা দিলে বা উৎকর্ষ সাধন করিলে নারী পুরুষ অপেক্ষা কোনরূপেই হীন নয় বরং দুই একটি গুণে—যথা সৌন্দর্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা, ধৈর্যে নারীই শ্রেষ্ঠ, তবুও নারীর সম্মান কম কেন? সুলভ ও সহজলভ্য বলিয়া কি?" তিনি বলেছেন, "সম্বন্ধ যেখানে আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতা, আত্মবল যেখানে হীনতা, দীনতা, মূল্য যেখানে রূপ ও রূপেয়া—সেখানে শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা তোলা বাতুলতা মাত্র।" রাজিয়া খাতুন আশা প্রকাশ করেছেন, "যেদিন নারী বহু সাধনার ফলে পরিণত হইবে, সেইদিনই তাহার সম্মান ও আদর হইতে পারে।"

আজকের বাংলাদেশের মহিলা সমাজ কি পারবেন না তাঁর সেই আশা-আকাঙ্খার অনুসারী হয়ে 'শিক্ষা' ও 'মুক্তি'র প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে সেদিনের রাজিয়া খাতুনের ও আজকের শহীদ নেতার স্বপ্নের বাংলাদেশের শক্তিময়ী, মঙ্গলময়ী নারীশক্তিতে পরিণত হতে? আরও কি যুগ যুগ ধরে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?

এদেশের মহিলা সমাজের কল্যাণমানসে স্বল্পায়ু জীবনে তিনি যতটুকু দিয়ে গিয়েছেন, সাহিত্য-জগতের জন্য যে জ্যোতির্ময় মনি-মাণিক্যের সংযোজন করেছেন; দীর্ঘ জীবনের সুযোগে হয়তো তাতে আরও বহু সম্ভাবনাময় যোজনা ঘটত; মহাকাল সে সুযোগকে করেছে সীমিত। তবুও যতটুকু আজ আমরা পেয়েছি, আহ্বান জানাচ্ছি আজকের নারী সমাজকে, সাহিত্যিককে, সমালোচককে তার যথার্থ মূল্যায়ন করার জন্য।

আমার আবেগ উদ্বেলিত হৃদয়ের শুকরিয়া জানাচ্ছি পরম করুণাময়ের কাছে—'আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে' তাঁরই শোণিত-ধারা, যে ধারার উত্তরাধিকার আমাকে প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রাণিত করেছে, পরিচালিত করেছে, তাঁরই আকাঙ্খিত, প্রদর্শিত পথে।

আজ এ রচনা সংকলন প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যাঁদের সাহায্য ও উৎসাহ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, তাদের সকলের কাছে আমি হৃদয়ের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—

রাজিয়া খাতুনের একমাত্র পুত্র, ভাই জামালের (যার একটা লেখা এই সঙ্কলনে সংযোজিত হওয়ার কথা ছিল) লেখা ছোট্ট একটা চিঠি আমাকে সম্পূর্ণ লেখাটারই সূত্র যুগিয়েছে। তারই দিক-নির্দেশনায় সংকলনটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। তাকে শুধু অভিযোগ জানিয়ে রাখছি, লেখা না দিয়ে এই সঙ্কলনকে অসম্পূর্ণ রাখার জন্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, স্নেহাস্পদ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌, যিনি সর্বপ্রথম ইত্তেফাকের রবিবাসরীয় আসরে রাজিয়া খাতুনের রচনাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাকে জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে যাঁর ঋণ অপরিশোধ্য, যাঁর অসুস্থ শরীরের অক্লান্ত পরিশ্রম এই সঙ্কলনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে, রাজিয়া খাতুনের অস্তিত্বকে বাঁচিয়েছে চির-বিলুপ্তির হাত থেকে ; সেই পরম শ্রদ্ধেয় জনাব আবদুল কুদ্দুস সাহেবের (এই গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক) ঋণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করেই রাখলাম। পরিশোধের চেষ্টা না করে কৃতজ্ঞতা ঋণে তাঁর কাছে চির-আবদ্ধ থেকে অন্ততঃ একটি 'বন্ধন সূত্র' তাঁর সঙ্গে থাকবে, এই কামনা করে স্মৃতিচারণে এখানেই ইতি টানছি।

রাবেয়া

কুমিল্লা
২৫-৩-৮২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কবিতা | পৃষ্ঠা

—০—

রচনা সংকলন

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

— ০ —

প্রবন্ধ

[প্রাবন্ধিকা রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী মুসলিম সমাজের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। সুক্ষ্মদৃষ্টি, জিজ্ঞাসু মন ও সজাগ অনুভূতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে অবস্থা বিশ্লেষণ করতে। সমসাময়িক মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার, নারীর স্থান, নারীর মর্যাদা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ ছিল, গভীর জ্ঞানের অধিকারিনী লেখিকা তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন। নারী শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট আর নির্দেশনা তীর্যক ও বলিষ্ঠ। 'মায়ের শিক্ষা' আলেখ্যটি চমৎকার, অতুলনীয়, অনুকরণীয়। মুসলিম সমাজে 'পর্দা ও অবরোধ' ইত্যাদির সঠিক ব্যাখ্যায় তিনি কুসংস্কারমুক্ত, ধর্ম-নিষ্ঠ মতে বিশ্বাসী। তারই প্রকাশ রয়েছে প্রবন্ধগুলির সর্বত্র। সাহিত্য সাধনায় মুসলিম নারী যুগে যুগে দেশে দেশে অমর অবদান রেখেছেন। তাদের অনুসারিণী এ লেখিকা স্বল্পপরিসর সাহিত্যিক জীবনে মণিমুক্তার কয়েকটি মালা গেঁথে রেখে গেছেন।

'জীবন সমস্যা' প্রবন্ধটি ধারণ করছে তার চিন্তার গভীরতা। তিনি দেখিয়েছেন লক্ষ্যপথের নির্দেশনা আর সক্রিয়তার বলিষ্ঠ যোজনা। ভাষা সুসমৃদ্ধ, গতিশীল ; ভাব সংযত সংহত কিন্তু দিগন্তপ্রসারী। প্রকাশ ভংগিমা পরিচ্ছন্ন, সাবলীল।]

বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাগণের শিক্ষার ধারা

রাজিয়া খাতুন

দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে মহিলাগণের চলিবে না। গৃহই নারীর উপযুক্ত স্থান। যে কোন গৃহকে ছোটখাট একটা রাজ্য এবং গৃহিনীকে সম্রাজ্ঞী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারীর উচিত—সর্ববিধ সুব্যবস্থা এবং সকলের সুখবিধানের চেষ্টা করা। বাহিরের কর্ম-কোলাহল হইতে ঘরে আসিয়া পুরুষ নারীর নিকট অনাবিল শান্তি ও স্নিগ্ধ সান্ত্বনা প্রত্যাশা করে। অনেক কলহপ্রিয়া নির্বোধ নারী এই সময় পারিবারিক কলহ বা অভাব-অভিযোগের কথা তুলিয়া কিরূপ অশান্তির সৃষ্টি করে, তাহা অনেক ভুক্তভোগীই অবগত আছেন। সংসারের কঠোরতা ও কুটিলতার মধ্যে নারীই আশ্রয় ও শান্তিস্বরূপ। যাঁহার গৃহে সেবাপরায়ণা বুদ্ধিমতি সুশিক্ষিতা সহধর্মিনী আছেন, তিনি দুনিয়াতেই স্বর্গসুখের অধিকারী। অবশ্য নারী বিপদে বন্ধু এবং উপদেশে গুরু, স্নেহ-পরায়ণ স্বামী কামনা করে। পুরুষেরও উচিত—নারীর উপযুক্ত স্বামী ও বন্ধু হইতে চেষ্টা করা। ভালবাসা বা বন্ধুত্ব শুধু একতর্ফা হইতে পারে না।

অনেক আত্মীয় বন্ধুই বলিয়া থাকেন, পারিবারিক জীবনে তাঁহারা সুখী নন। ইহার প্রধান দুইটি কারণ থাকে। প্রথম কারণ, অনেক পুরুষই স্বভাবতঃ খুঁৎ খুঁতে। পত্নী শত প্রকারে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলেও তাহারা সর্বদাই খুঁৎ ধরিতে থাকে। দ্বিতীয় কারণ, প্রায় শিক্ষিত পুরুষমাত্রেই অশিক্ষিতা পত্নীর প্রতি বিরক্ত থাকে; অথচ নিজে 'অবকাশ পাইনা,' বা শিক্ষার বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—এইরূপ নানা অজুহাত দিয়া পত্নীকে

সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখে। ওদিকে "মেয়েদের হাতে কলম আর গোক্ষুরা দেওয়া সমান কথা"—এইরূপ মতের পিতারও অভাব নাই। যত দোষ ঐ পত্নী বেচারীর—যিনি ১২ বৎসরে সহধর্মিনী ও ১৪ বৎসরে সন্তানের জননীর আসন গ্রহণ করেন। ইহার সর্ব-প্রধান উপায়, মুসলমান মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত করা এবং বিবাহের পূর্বেই গৃহিণীর উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। অনেকে শিক্ষার নামে সামান্য উর্দু বা ফার্সী পড়ান; কেহ বা কার্পেট বা লেস ইত্যাদি বুনিতেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। কাজের অভাবে যাহাদের সময় কাটে না, আমি তাহাদের কথা বলি না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের কথাই এখানে আলোচিত হইতেছে। লেস ইত্যাদি বুনা অপেক্ষা নিজের ও ছেলেদের জামা সেলাই করিতে জানিলে অনেক অপব্যয় হইতে বাঁচা যায়। বোতাম লাগাইতে যেন দর্জীর কাছে ছুটিতে না হয়।

বাঙ্গালী মুসলমান মেয়েদের প্রায় সকলকে কোরান শরিফ পড়ান হয়। এই সঙ্গে কিছু উর্দু ও বাংলা শিখান কঠিন নহে। কিন্তু ৯ বৎসর বয়সেই যাহারা অবরোধ প্রথার কল্যাণে অন্তপুরবাসিনী হইতে বাধ্য হয়, তাহাদের পক্ষে দুইটা ভাষা শিক্ষা করা সহজ নয়। সুতরাং বিকৃত ও বীভৎস উচ্চারণে আরবী শব্দগুলি আওড়াইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। অবশ্য অর্থ না জানিলে শুদ্ধ করিয়া পড়া সম্পূর্ণ সম্ভবও নয়। কিন্তু অর্থ যাহাতে বিকৃত না হয়, ওস্তাদের সেদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অন্ততঃ ১৩।১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষায় ব্যয় করা উচিত। বিশুদ্ধ কোরান শরীফ পাঠ, মোটামুটি উর্দু ও বাংলা ভাল বই বুঝিয়া পড়িবার শক্তি, দেশপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান, ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজগণের ইতিহাস, ভারতীয় অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও জমা-খরচ রাখার মত অঙ্ক জানিলেই যথেষ্ট। বাকী ৫।৬ বৎসর রন্ধন ও সেলাই ইত্যাদি শিক্ষায় ব্যয়িত হইতে পারে।

গৃহশিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। গৃহে প্রাথমিক

চিকিৎসার পর তবে ডাক্তার ডাকিবে। সামান্য একটু চিরতার পানি, তোক্‌মারির পুল্‌টিস, চূণ-হলুদ বা নারিকেল তৈলের সুপ্রয়োগের অভাবে যেন পালাজ্বর বা বিষাক্ত ক্ষত না হইয়া পড়ে। গৃহে মাতার নিকট ৫।৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বালক স্কুলে যাইবে; তবেই বলি সু-গৃহিণী। অবশ্য শিক্ষা ব্যতীতও অনেকে সুগৃহিণী হইয়া থাকেন। কিন্তু গার্হস্থ্য শিক্ষা ও বাহ্য শিক্ষা মিলিত হইলেই সোনায় সোহাগা হইয়া থাকে। শিক্ষার প্রধান অন্তরায়-বাল্য বিবাহ ও অবরোধ-প্রথা। আমি পর্দা মানি, কিন্তু অবরোধ-প্রথার সমর্থন করি না। অবরোধ মানবের অন্তঃকরণকে ক্লিষ্ট ও পরাধীন করিয়া ফেলে। বিশেষ বিশেষ অপরাধে পুরুষগণ অবরোধবাসী হইতে বাধ্য হন, কিন্তু মহিলাগণ বিনা অপরাধেই শাস্তি ভোগ করিতেছেন। চোখ-বাঁধা ঘানির বলদ ও বঙ্গীয় মোসলেম মহিলায় বিশেষ পার্থক্য নাই। অথচ শিক্ষিত স্বামী এইরূপ বধুর নিকট হইতেই শিক্ষা, সুরুচি ও মানসিক সৌন্দর্যের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক আর কুহার্টের পত্নী শ্রীমতী আর কুহার্ট, 'বাঙ্গলার নারী' নামে একখানা বই লিখিয়াছেন; তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এই বইয়ের ভিত্তি; একজন বিদেশিনী বিদূষী মহিলা আমা-দিগকে কিভাবে দেখিয়াছেন, তাহা জানিবার কৌতূহল সকলেরই হইতে পারে। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "বাংলা দেশের কোন কোন মেয়েদের স্কুল ও কলেজে একটি বিষয় খুব চোখে পড়ে—সেখানে বেশ্যাকন্যাগণের সংখ্যাধিক্য। বলা বাহুল্য, গণিকাগণ তাদের মেয়েদিগকে স্কুলে পড়াইয়া সুশিক্ষিতা করে বিবাহ দিবার জন্য নয়, ভালরূপে বেশ্যাবৃত্তি করাইবার জন্যই। গণিকারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা এইসব স্কুল-পড়া কিশোরী ও যুবতীদের প্রতিই অধিক অনুরক্ত। নৃত্যগীত, চিত্রকলা প্রভৃতিতে ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিতা। আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা গৃহে পত্নীদের নিকট যাহা পায় না—সমাজে যে নারীসঙ্গ পায় না—অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও যুগধর্মের প্রভাবে যাহা তাহাদের একান্ত কাম্য, তাহাই তাহারা

এই শিক্ষিতা গণিকাদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে এবং দুধের সাধ ঘোলে মিটায়। আর চাহিদা যোগানের নিয়ম-অনুসারে গণিকারাও পাকা ব্যবসায়ীর মত সেই জিনিষটিই সরবরাহ করিতে চেষ্টা করে।"

এই কয়েকটি কথা হইতেই শ্রীমতী কুহার্টের অসামান্য অভিজ্ঞতা ও সমাজের অবস্থা বুঝা যায়। এই কথাগুলি বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের জন্যই খাটে বেশী; কারণ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যেই শিক্ষিতা মহিলা কম। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে মহিলা গ্রাজুয়েট নাই বোধ হয়। যে দুই একজন আছেন, তাঁহারাও উর্দ্দু ভাষিণী। অনেকে বলেন, মানসিক সৌন্দর্য বাহ্যশিক্ষা-সাপেক্ষ; কিন্তু জটিল রহস্যপূর্ণ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর মনকে ধীর, স্থির ও সৌন্দর্যপূর্ণ করার একমাত্র উপায়ই শিক্ষা।

বঙ্গীয় মোসলেম মহিলাগণের স্বাস্থ্যহীনতাও দর্শনীয় বিষয়। সঙ্গতি-সম্পন্নদের ভিতর অনেকে হাওয়া বদলাইবার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়া থাকেন। নিম্নশ্রেণীর মহিলাগণও কিছু আলো-হাওয়ার মুখ দেখে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্র মহিলাগণের দিনরাত্রি সবই সমান। কোন প্রকার ব্যায়ামের চর্চা তো নাই-ই। বরোদার নাজির বাঈ কি না করিতেছেন! কলিকাতায় দীপালি সঙ্ঘও মন্দ কাজ করে নাই। এইরূপ প্রতিষ্ঠান মুসলমানের আছে কি? ফলে মহিলাগণ হয় তূলার বস্তার ন্যায় মোটা হইতেছেন! সুগঠিতদেহ কয়টি মহিলার দেখা যায়? আমাদের সৌন্দর্যের আদর্শ—কটা চামড়া। কিন্তু স্বাস্থ্যশ্রীই যে প্রকৃত সৌন্দর্য, তাহা আমরা কবে বুঝিব? ক্লিওপেট্রা কি ফর্‌সা ছিলেন?

সৎগ্রন্থ পাঠ করা মানসিক সৌন্দর্য লাভের উপায়। কিন্তু কুরুচিপূর্ণ নাটক, নভেল ও অপাঠ্য গল্পের বই ব্যতীত মহিলা পাঠ্য বই নাই বলিলেও চলে। যাও দু' একখানা আছে, তাহা আমাদের পড়িতে রুচি হয় না। সাহিত্যের ধারা ও মানুষের ব্যক্তিগত রুচি একই স্রোতে মিশিয়াছে।

বাঁধা গৎ অনুসারে প্রেমে পড়া ছাড়া বই হয় না—হইলেও তাহা পাঠক-পাঠিকা, বিশেষতঃ পাঠিকাগণের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য বই বিক্রয় হয় না বলিলেই চলে। আমার ধারণা ছিল, সাহিত্যের ধারার পরিবর্তন হইলে মানুষের মনের গতিও ভিন্নমুখী হয়। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার বিপরীত দেখিতেছি।

সমাজে একচোখোমি আজিও ঘুচিল না। সচরাচর মুসলমান সমাজে বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করা হয় না। ইহা অপেক্ষা হীন মনোবৃত্তি আর কি হইতে পারে? অধিকাংশ গৃহেই নারীর প্রতি গৃহ-পালিত পশু অপেক্ষা অধিক সদ্-ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য অত্যাচারী পুরুষগণ প্রায়ই অধিক শিক্ষিত নন, অথবা শিক্ষিত হইলেও আমি সে শিক্ষাকে শিক্ষাই মনে করি না। যে শিক্ষা নারীর প্রতি সম্মান করিতে না শিখায়, সেরূপ শিক্ষা না হওয়াই শ্রেয়ঃ। পবিত্র কোরানে রহিয়াছে, "তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের উপরও তাহাদের অধিকার আছে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কোমল ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিও। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।" এই সুমহান আদেশ কয়জনে মানিয়া চলে? অবশ্য সুখী পরিবার ও উন্নতমনা পুরুষের অভাব নাই। আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। কিন্তু সে নিতান্তই 'সিন্ধু মাঝে বিন্দুসম।'

কোরানের বিধান-অনুসারে প্রত্যেক কন্যাই পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। দুনিয়ার অন্য কোন জাতির মধ্যে এই অধিকার নাই। এমন যে সুসভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ইংরেজগণ—যাহাদিগকে অনেকে সভ্যতার আদর্শ মনে করেন—তাহারাও পৈতৃক সম্পত্তির উপর কন্যাগণের অধিকার আজিও দেয় নাই। কিন্তু শুধু সম্পত্তি দিলে কি হইবে? সম্পত্তি-রক্ষণোপযোগী শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক পিতার উচিত নয় কি? গৃহের যিনি সম্রাজ্ঞী, গৃহ ও গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সকল প্রকার শিক্ষাই পাওয়া দরকার। কিন্তু আশ্চর্য ও

পরিতাপের বিষয়, অনেকস্থলে কন্যাকে সম্পত্তি দেওয়ার ভয়ে পিতা বা ভ্রাতা অশিক্ষিত বা দরিদ্র পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন। সম্ভ্রান্ত সমাজেই এরূপ কাণ্ড বেশী দেখা যায়। কোন কোন সুসন্তান পিতার মৃত্যুর পর মাতার সম্পত্তি নিজ নামে লিখাইয়া লইয়া ভরণপোষণও ভার বোধ করিয়া মাতার পুনর্বিবাহ দিয়া থাকেন। সমাজে এরূপ গলদ অল্প নহে। এই সমস্ত বিভ্রাট ও দুর্দশার হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যেক পিতারই উচিত—কন্যাকে সুশিক্ষা দেওয়া।

অনেক স্থলে দেখা যায়, মহিলাগণ শিক্ষার ফলে স্নেহহীনা ও কঠোরচিত্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু সেরূপ শিক্ষা আমাদের স্পৃহনীয় নয়। যে শিক্ষা নারীকে নমনীয়, কমনীয়, মহৎ ও উদারচিত্ত করিবে, সেই শিক্ষাই আমরা চাহিতেছি। শিক্ষার অনেক উদ্দেশ্য আছে। প্রধানতঃ বাঙ্গলার কি পুরুষ কি নারী সকলেই জীবিকা-নির্বাহের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। এ শিক্ষার কোন প্রকারে জীবিকা-নির্বাহ হয় সত্য, কিন্তু অন্য কোন লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞান-লাভের জন্য যে শিক্ষা, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। সে শিক্ষা মানুষকে দুনিয়ার নানা জাতির সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে শিক্ষা দেয় এবং সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহশীল, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, দাসদাসীর প্রতি দয়ালু, স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী, প্রেমময়, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও ধর্মবিশ্বাসী করিয়া তোলে। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। কোরানই এই শিক্ষার প্রথম ও শেষ সোপান। বিশেষ করিয়া এই কথাটাই মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষার সময় কখনও উত্তীর্ণ হইয়া যায় না! দুনিয়াতে প্রকৃতির পাঠশালায় মানুষ চিরদিনই ছাত্র-ছাত্রীরূপে গণ্য।

কলিকাতার প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়ে ছাড়া বাসিন্দামেয়েদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চা নাই। মফঃস্বলেও বিশুদ্ধ বানানে চিঠিপত্র লিখিতে পারে এরূপ মেয়ে পাওয়া দুরূহ। আশা করি, যে দুই একজন শিক্ষিতা মহিলা আছেন, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। সুখের বিষয়, দুই একজন পিতা বিবাহের

সুবিধা ও শিক্ষিত সুপাত্রের নিকট কন্যা বিবাহ দেওয়ার আশায় শিক্ষা দিতেছেন। তাই বা মন্দ কি? যেটুকু পাওয়া যায়, সেইটুকুই লাভ।

হাদিসশরীফ অনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা করা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ। কিন্তু আধুনিক সমাজ তাহার উল্টা করিতেছে। আত্মীয়স্বজন শিক্ষিত হইলে মেয়েদের শিক্ষার কোনই বাধা হয় না। বাল্যে পিতামাতা, কৈশোরে ভ্রাতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং শিক্ষা কোন সময়েই দুর্লভ বস্তু নয়। কিন্তু শৈশবই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। বাল্যে অমৃতময় মাতৃক্রোড়ে বসিয়া যে শিক্ষা পাওয়া যায়, যৌবনে বা বার্ধক্যে নানা চিন্তা-উদ্বেলিত হৃদয়ে সে শিক্ষালাভ কঠিন হইয়া পড়ে। সন্তান জন্মের বিশ বৎসর পূর্ব হইতে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ভ্রূণাবস্থা হইতেই যেন তাহার মনের উপর শিক্ষার ছাপ পড়ে। এই যে মনের ভাবগুলি যেমন তেমন করিয়া প্রকাশ করার শক্তি, ইহা আমি আমার মাতার নিকট হইতেই লাভ করিয়াছি। তিনি শিক্ষিতা না হইলে এটুকু হইত কিনা সন্দেহ। কন্যার জন্য মাতাই উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী।

আমার সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান বক্তব্য এই যে, ধর্মই নারীজাতির সর্বপ্রধান অবলম্বন। ধর্মের প্রত্যেক অনুশাসন যিনি মানিয়া চলিবেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিতা। দুর্দিনে যখন হস্ত রিক্ত ও শরীর উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িবে, আত্মীয়স্বজনগণ পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় খসিয়া পড়িবে, স্বামী বিমুখ হইবেন ও একমাত্র আশা-ভরসাস্থল পুত্রও পর হইয়া যাইবে, তখন অভাব-অভিযোগ শুনিবার, সান্ত্বনা ও আশ্রয় দিবার এবং স্নেহ-প্রলেপে হৃদয়ের ক্ষত দূর করিবার কে আছে? ধার্মিকা মহিলা সেই দুর্দিনেও একমাত্র আল্লাহ্‌তালাকেই হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া দুঃখভার লাঘব করেন। শিক্ষিতা ধর্মবিশ্বাসহীন অপেক্ষা অ-শিক্ষিতা ধার্মিকাকেই আমি শ্রেষ্ঠা মনে করি। কেন না জ্ঞানী-গণের বক্তৃতা অনুসারে শিক্ষিত অধার্মিক পথভ্রান্ত অশ্বারোহী ও অশিক্ষিত ধার্মিক পথাভিজ্ঞ পদাতিকরূপে গণ্য। কিন্তু তজ্জন্য কাহারও মূর্খ থাকা

উচিত নয়। কেন না, প্রাচীনযুগে হজরতের সময়ও স্ত্রী শিক্ষার খুব প্রচলন ছিল। মাতা খোদেজা ও আয়েশা সিদ্দিকা অত্যন্ত শিক্ষিতা ছিলেন। কবিতা ও আইন জ্ঞানের জন্য মাতা আয়েশা সিদ্দিকা বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। হজরত স্বয়ং বলিয়াছেন, "তোমরা এই রক্তাভা গৌরবর্ণা মহিলাকে গুরুরূপে বরণ করিতে পার।" প্রাচীন যুগেও স্পেনের গৌরব যুগে আরব এবং স্পেনে মহিলাগণ কবিতা রচনা, সাহিত্যালোচনা, চিকিৎসাবিদ্যা ও ধর্মালোচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আজিও তুরস্ক ও মিসরে মহিলাগণ পূর্ব খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করিতেছেন। শুধু বঙ্গ-মহিলাই কি ঘুমাইয়া থাকিবেন ? আমি যে সমস্ত কথা আলোচনা করিলাম, তাহা নিতান্তই ঘরোয়া কথা। প্রত্যেক মহিলা-মজলিশে পরনিন্দা, পরচর্চা ও কুতর্ক ছাড়িয়া এ সমস্ত বিষয় আলোচিত হইতে পারে।*

* সওগাত, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৩৪, পৃঃ ৭০-৭৩

সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান

রাজিয়া খাতুন

অত্যাচার ও দুঃখভার প্রপীড়িতা নারীর বিষয় কিছু লিখিতে গেলেই মনটা ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। অতীতে আমাদের সমাজে চাঁদ সুলতানা, নূরজাহান, জাহানারা, জেবউন্নিসা প্রভৃতি ছিলেন, এসব কথা বলায় লাভ আছে কি? আছে শুধু ক্ষণিকের সুখ আত্মপ্রসাদ। অতীতের মোহে আত্মহারা হওয়া ঠিক নয়, আবার অতীতের কথা ভুলিয়া যাওয়াও উচিত নয়। অতীতকে মনে রাখিব ও অতীতের আলোচনা করিব ভবিষ্যতকে তদপেক্ষাও ভাস্বর ও প্রভদীপ্ত করিয়া তুলিতে।

এতদিন মোসলেম নারী সমাজ সমস্ত অবিচার সহিয়াও নীরব ছিল, কেননা পৃথিবী তাহাদের গৃহমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন দু'একজন করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া বহির্জগতের সহিত পরিচিত হইতেছেন। তাই ক্রমে তাহাদের চোখ ফুটিতেছে! ইহাতে সমাজের প্রাচীনপন্থী দল বলিতেছেন, "তাইত! লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েগুলোর ঘাড়ে ভুত চাপিল। উহাদিগকে হেরেমের কঠোরতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে উহারা বাঁচিবে না।" আমরা যে এতদিন বাঁচিয়াছিলাম, তাহাই আশ্চর্য। পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি হইয়াছে, গভর্ণমেন্টের দয়ায় মানুষ খুন করিলে ফাঁসী হয়, আর আমরা যে এতগুলি প্রাণী আলো হাওয়া বঞ্চিত হইয়া আশা, আনন্দ ও উৎসাহ শূন্যভাবে অন্তঃপুরের কঠোর অবরোধ ও পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে তিলে তিলে মরিতেছি, সেদিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া পথে ঘাটে বেড়ানো পছন্দ করি না, কারণ তাহাতে নারীর সম্ভ্রম, সৌকুমার্য ও কোমলতা নষ্ট হয়। শরিয়তে যতটা পর্দা আছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা অর্থ রাস্তায় নাচিয়া বেড়ানো নয়,

আমরা চাই প্রকৃত মুক্তি, যা মনকে উন্নত, মহান, পবিত্র, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় করে ; নিজের ধর্ম ও সত্যের সহিত পরিচিত করে ; অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বিভিন্ন তথ্য আমাদের মনোগোচর করিয়া দেয়। সমাজ কি এইটুকুও দিতে পারে না ?

পুরুষ আমাদের সম্মান ও মর্যাদা করে গুণানুসারে। কন্যা, মাতা, ভগিনী বা সহধর্মিনী বলিয়া নয়, আমরা সৌন্দর্য, রন্ধন ও সেবায় কতটা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারি, তাহাই তাঁহারা দেখেন। সাধারণতঃ এই তুলাদণ্ডেই আমাদের ওজন করা হয়। এই দিক দিয়া যদি কোথাও ত্রুটি থাকে, তবে সে নারীর আর নির্যাতনের সীমা থাকে না। তাহারা এটুকু বিচার করে না যে, নিখুঁৎ সুন্দরী বধূর স্বামীরূপে অন্ততঃ সুশ্রী বলিয়া দাবী করিবার এবং কর্ম-নিপুণা, পতিব্রতা ও সতী স্ত্রীর স্বামীরূপে কর্মঠ, স্নেহময় ও কি না ! চরিত্রবান নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা তাহাদের আছে ? এই 'সতী' শব্দটা এক প্রহেলিকা। ইহা নারীদের প্রতি সর্বস্থানে এবং যখন তখন প্রয়োগ করা হয়,—কিন্তু পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করার মত ইহার প্রতিশব্দ বাংলা, বা এমন যে সভ্য ইংরেজি ভাষা, তাহাতেও নাই। 'সতীত্ব' (Chastity) এসব বুলি একমাত্র নারীর জন্যই একচেটিয়া ভাবে তৈরী হইয়াছে। ইহা কি পুরুষের নৈতিক হীনতার পরিচায়ক নয় ? অবশ্য নৈতিক চরিত্র বলিতে শুধু একদিক বুঝায় না, চরিত্রগত সমুদয় গুণকেই বুঝাইয়া থাকে। "সৎ" শব্দ হইতেই "সতীত্বের" উৎপত্তি। সুতরাং মানব চরিত্রের যে কোন গুণের হ্রাস পাইলেই তাহাদের 'অসৎ' 'অসতী' নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু নারীর প্রতি 'অসতী' শব্দ যে ভাবে ব্যবহার করা হয়, পুরুষের প্রতি 'অসৎ' শব্দ কি সেইভাবে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ?

আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয়, যখন চরিত্রহীন স্বামী পত্নীর মাথার ঘোমটা পড়িলে ক্রুদ্ধ হন, আর লুশনিন্দিত দেহের বর্ণ লইয়া পুরুষ অপ্সরা

বা ডানাকাটা পরী কামনা করেন এবং ষাট বৎসরের প্রৌঢ় ষোল বৎসরের তরুণী ঘরে আনিতে উৎসুক হন! সমাজেও নারীর মর্যাদা এই।

পল্লীগ্রামে অনেকের অভ্যাস আছে পত্নীকে প্রহার করা। ইহা যে পল্লী মানবের বৈশিষ্ট্য, তাহা বলি না; কারণ অনেক শহুরে ভদ্রলোকও প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় উপরোক্ত গুণটার সদ্ব্যবহার করেন। তবে শহরে লোকলজ্জা ও নারীর তেজস্বিতার ভয়ে এবং পারিপার্শ্বিক শিক্ষার গুণে ইহা সংক্রামক হইতে পারে না। মোটের উপর অত্যাচারী ও অনাদর-কারী শিক্ষিত স্বামী অপেক্ষা অশিক্ষিত স্বামী অনেক ভাল। তাহারা স্ত্রীর বিশেষ কোন ব্যবহারকে অমার্জ্জনীয় অপরাধ ভাবিয়া প্রহার করে, উহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র; কিন্তু শিক্ষিতের ক্রোধ ও অবহেলা বড় ভয়ানক। তাহা অনেক নারী জীবনকে দুঃসহ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। অনেক উৎপীড়িতা পল্লীনারীর সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা এই উত্তেজনামূলক প্রহারকে স্নেহের দাবী ও অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। তবে পল্লীতেও অসুখী নারী আছে। অত্যাচারের ধারাও সব সময় এক নয়। পল্লীর পুরুষগণ সাধারণতঃ শহুরে ভদ্রলোকের ন্যায় মাতাল ও চরিত্রহীন হয় না। তাহারা সকলেই যে মহাধার্ম্মিক, একথাও বলি না। ভালমন্দ সব সমাজেই আছে। এই সমস্ত কলঙ্কের প্রতিকার নারীর হাতেই। তাঁহারা শক্তিময়ী ও তেজস্বিনী হইলে কাপুরুষের সাধ্যও নাই যে অত্যাচার করে।

অতএব দেখা যায়, সমাজে আমাদের আদর শুধু রূপ ও সেবার জন্য,—সম্বন্ধ হিসাবে নয়। অনেক স্থলে, রূপই গুণ অপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করে। যে গৃহে দুই স্ত্রী, সে গৃহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রূপ যৌবনের আকর্ষণেই পুরুষ নারীকে গ্রহণ করে এবং যে নারী পতি সেবা অধিক করিতে পারে, তারই অধিক খ্যাতি হয়। কেহ যেন মনে করিবেন না আমরা নারী-সমাজকে পুরুষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চাই। আমরা নারীকে গৃহলক্ষ্মী

হইয়া উচ্ছৃঙ্খল পুরুষগণকে সংযত ও সংহত করিতে বলি, নিজের স্থান অধিকার করিয়া সত্রাজ্ঞীস্বরূপা হইতে বলি। দুনিয়াতে পুরুষ ও নারীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না। পুরুষ কর্ম, নারী শক্তি; পুরুষ কর্মক্ষেত্র, নারী গৃহ; পুরুষ লালসা, নারী তৃপ্তি; পুরুষ কামনা, নারী সংযম; পুরুষ উগ্র আবেগ, নারী শান্তি। দুইয়ের মিলনেই সংসার মধুময় হয়, তাই বিবাহের উৎপত্তি। এই Co-operation বা সহযোগমূলক বিবাহকে লোকে আত্মবিক্রয়ে পরিণত করিয়াছে। মনোরঞ্জন যেখানে বাধ্যতামূলক, সেখানেই গণিকাবৃত্তির উৎপত্তি। আমরা বারাঙ্গনাদিগকে ঘৃণা করি; কিন্তু ঘরে ঘরে গণিকাবৃত্তি চলিতেছে, সেদিকে লক্ষ্য করি না। স্বামী ভালবাসে না, তবুও তাহাকে রূপ যৌবন ও বেশভূষার আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, তবুও নিত্য নব সাজে সজ্জিতা হইয়া তাহার মন ভুলাইতে হইবে। ইহাকে শুদ্ধ ভাষায় "পাতিব্রত্য" বলিতে চাও বল, কিন্তু আমার মতে তাহা ঠিক উল্টা। স্বামী যদি ভালবাসে তবে স্ত্রীও মনোরঞ্জন করিবে,—তাই বলিয়া গণিকা সাজিবে কেন? কয়টি সন্তান পবিত্র মনোভাব হইতে উৎপন্ন? তাই সেগুলির মনও হয় পিতামাতার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও লালসাদীপ্ত, ইংরেজীতে যাহাকে বলে "Flirtation"। অনেক স্বামী নূতনত্বের নেশা কাটা পর্যন্ত স্ত্রীর মুখ দেখেন, তৎপরই আবার নূতন ফুলের সন্ধানে ছোটেন। স্ত্রীরও উচিত দৃপ্তভাবে তেজস্বিতা, যুক্তি ও ভালবাসা দ্বারা স্বামীকে ফিরাইবার চেষ্টা করা। ইহাতে অকৃতকার্য হইলে সরিয়া পড়া—কুকুরের ন্যায় পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ানো কোন মতেই উচিত নয়।

অনেকে বলেন, বিবাহে প্রেম হয় না—প্রেম কামনাহীন। একথার কোন ভিত্তি নাই। প্রেম পাত্রের মধ্যে সর্বকামনা ও আকাঙ্খার সমাপ্তি করিয়া কুৎসিত, পুরাতন ও বৃদ্ধকেও যে ভালবাসায় সুন্দর, নিত্য-নূতন এবং প্রাণময় করিয়া দেখিতে পারে, সেই-ই যথার্থ প্রেমিক বা প্রেমিকা। নৈকট্য

লালসাকে সংযত ও সংহত করে, উগ্র প্রেম স্নিগ্ধ করে। হাস্নাহানা যে দিন বেলায় পরিণত হয়, সেই দিনই সাধনার সমাপ্তি। কোন প্রেমই কামনাশূন্য নয়। মাতা কামনা করে—পুত্র বড় হইয়া দেশের ও দশের মুখোজ্জল করিবে, সুন্দরী ও গুণবতী বধূ আনিয়া তাঁহার নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিবে। সন্তান চায়—পিতামাতা তাহাদিগকে ভালবাসা, স্নেহযত্ন, উত্তম বসনভূষণ, এবং উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবে। পতি পত্নী চায় পরস্পরের যত্ন, ভালবাসা, সেবা ও সহানুভূতি। আল্লাহতালার প্রতি আমাদের যে প্রেম, তাহাও কামনাময়। তাঁহাকে ভালবাসি বিনা স্বার্থে নয়। এমন যে তাপসী রাবেয়া—তিনিও ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ চাহেন নাই সত্য, কিন্তু মানসিক সুখ চাহিয়াছেন, স্বয়ং আল্লাহতালাকেও তাঁহার প্রেম চাহিয়াছেন। সামাজিক ও পারিবারিক ধারার জন্য অনেকে প্রেমাস্পদকে পায় না। এই ব্যর্থ প্রেম হইতেই কবির কামনাহীন প্রেমের উৎপত্তি। কিন্তু ও মোহ কিছুই নয়, দুইটি নিরাশ প্রেমিক প্রেমিকার মিলন করিয়া দাও, দেখিবে সেই উন্মত্ত আবেগ ও মোহ দুইদিনেই প্রশমিত হইয়া যাইবে। তখন সেই সর্ব্বগুণময়ী মানসী তিলোত্তমা ও রামী শ্যামীর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না। সর্ব্ব দোষ ত্রুটিসত্বেও বিবাহিত পতি পত্নী পরস্পরে ভালবাসে, সেইটুকুই বিবাহের বিশেষত্ব। ইহা অপেক্ষা পবিত্র ও মধুময় প্রেম আর কি হইতে পারে? মরু মরীচিকার আশায় না ছুটিয়া আল্লাহতালা স্বহস্তে যাহাকে জীবন পথে আনিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই স্ত্রী পুরুষ সকলে যদি সন্তুষ্ট থাকে, তবে গৃহ কল্যাণ ও মঙ্গলময় হইবে। বস্তুতঃ যে গৃহে ও সমাজে নারীর সম্ভ্রম নাই, সে গৃহ ও সমাজের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। *

* সওগাত, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ভাদ্র ১৩৩৪ পৃঃ ২৭৩-২৭৫

নারীর কথা

রাজিয়া খাতুন

পৃথিবীতে নারী অপেক্ষা পুরুষের মর্যাদা অধিক, ইহার কারণ কি? বিদ্যা বুদ্ধি রূপ গুণে, সমভাবে শিক্ষা দিলে বা উৎকর্ষ সাধন করিলে, নারী পুরুষ অপেক্ষা কোন রূপেই হীন নয়, বরং দুই একটি গুণে যথা—সৌন্দর্য, বাৎসল্য, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যে নারীই শ্রেষ্ঠ। তবুও নারীর সম্মান কম কেন? সুলভ ও সহজপ্রাপ্য বলিয়া কি? কিন্তু সংখ্যায় পুরুষ নারী অপেক্ষা কম তো নয়ই, বরং অনেক স্থলে বেশী। তবে নারী খুব দুষ্প্রাপ্যও নয়। বোধ হয়, নারী যেদিন বহু সাধনার ফলে পরিণত হইবে সেইদিনই তাহার সম্মানও আদর হইতে পারে। কিন্তু বিবাহ ছাড়া নারীর গতি আছে বলিয়া যে জাতি ভাবিতেও পারে না তাহারাই যে কন্যাকে আদরণীয়া ও সম্মানীতা করিয়া তুলিবে সে আশা পরাহত। মেয়ে সাত বৎসরের হইলেই যে বাপের মুখে ভাত রুচেনা, ছেলের পিতার বাড়ী তখন দরগা বা মহাতীর্থ হইয়া উঠে, জুতার ঘন ঘন সংস্কার তখন কন্যার পিতার নিত্য কর্ম হইয়া উঠে। দেশের আবহাওয়া ও হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানগণও তাহাই করিতেছে। পুত্র বৎসল পিতা বা পিতৃভক্ত পুত্র নানা অলঙ্কার ও যৌতুক সমন্বিতা কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া কন্যা ও কন্যার পিতাকে কৃতার্থ করেন, অনেক স্থলে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত পড়ার খরচও আছে। সম্বন্ধ যেখানে আশ্রয় দাতা ও আশ্রিতা, আভরণ যেখানে হীনতা দীনতা, সহানুভূতি যেখানে সংহত, করুনা যেখানে ঘৃণায় পরিণত, দুঃখ ও দান যেখানে দয়া, মূল্য যেখানে রূপ ও রুপেয়া, সেখানে শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা তোলা বাতুলতা মাত্র।

নানা জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রেই খ্রীষ্টান জাতির কথা মনে পড়ে, কারণ তাহারা গর্ব্ব করেন এবং অনেকে বলে যে পৃথিবীর প্রায় সব জাতি অপেক্ষা তাহারা শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত এবং নারীর সম্মানও খুব বেশীই করিয়া

থাকেন, এতো ব্যক্তি বা জাতিগত, কিন্তু আলোচনায় কি ইহা সত্য বলিয়া
দাঁড়ায়? প্রথমেই দেখি, তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল নারী জাতি সম্বন্ধে
বলে "Root of all evils" অর্থাৎ "সমস্ত অহিতের মূল।" ইহা পাঠ করিয়া
জনসাধারণের মনে কিরূপ ধারণা বদ্ধমুল হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।
৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আহূত ওমিয়ার ক্রীশ্চান ধর্ম সভ্যে স্থির হইয়াছিল—নারীর
আত্মা নাই। এই মহা ধার্মিক জাতি ১৩/১৪ শত বৎসর নারীকে যে
রূপ লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করিয়াছে সেরূপ আর কোন জাতি করে নাই।
সেন্ট পল বলিয়াছেন "নারী মাত্রই স্বামীর অধীন। ঈশ্বর নারীকে পুরুষের
জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষকে নারীর জন্য করেন নাই। নারীই জগতে
পাপ আনিয়াছে। তাহারা অনন্তকাল নরকে থাকিবে, তবে সন্তান গর্ভে
ধারণ করিলে মুক্তি পাইতে পারে। ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করার অধিকারও
তাহাদের নাই।" কি চমৎকার মত? যে ধর্মে শাস্ত্রপুস্তক এবং ধর্ম
যাজকের এইমত, সেই ধর্মের জনসাধারণ যে নারীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা
করিবে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন নয় কি? ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বাইবেলের মতে
নারীর সন্তান না হওয়া মহাপাপ। যদি স্বামী গৃহে স্থান বা নিজের উপার্জ্জন
ক্ষমতা না থাকে তবে ইংলণ্ডের নারী একেবারেই অসহায়। পিতৃগৃহে দু'টি
ভাত পাওয়ারও আইনতঃ তাহার অধিকার নাই। সম্পত্তি পাওয়া তো
দূরের কথা। ইহাই হইতেছে সুশিক্ষিত ও সভ্য জাতির নারীর প্রতি সম্মান
প্রদর্শনের নমুনা? এতদিন বিলাতে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা বলড্যান্স,
গার্ডেন পার্টি ও রাস্তায় বেড়ানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আজকাল তবুও
শিক্ষিত হওয়ায়, নিজে খাটিয়া খাওয়ার ও ভোটের অধিকার তাহারা
পাইয়াছে। ইহারা প্রাচীন ইহুদিদিগের আইন কানুনেরই বেশী ভক্ত, তবে
অনেক কুপ্রথাই আজকাল উঠিয়া গিয়াছে।

হিন্দুদের অধিকাংশ উপাস্যই স্ত্রী জাতীয়া। তাই নারীর সম্মান বেশী
থাকাই হিন্দুধর্মে সম্ভব। কিন্তু তাহা হিন্দুদের জীবনে খুব বেশী ফুটিয়া উঠে
নাই।

নাই। এ ধর্মের প্রধান কলঙ্ক—অসুর বা পৈশাচ বিবাহ, সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তান দান ও ক্ষেত্রজ বা জারজ পুত্র উৎপাদন। এসব বিধানে আছে পুরুষের নির্যাতন ও নারীর কলঙ্ক। অসুর বিবাহ যদি বিবাহ হয় তবে আধুনিক গুণ্ডাদের দোষ কি? সৌভাগ্যের বিষয়, এসব প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তবে বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি—ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন আজিও অত্যন্ত গোপন ভাবে চলিতেছে, এবং কোন কোন প্রসিদ্ধ আশ্রমের যুবকগণকে ধনীরা ঐ কাজের জন্য লুব্ধ করে। মাঝে মাঝে কেলেঙ্কারীও ঘটে। এ সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া কোন নারীর পক্ষে উচিৎ বা সম্ভব নয় তবে ইহা মিথ্যা হওয়াই ভাল। জগত হইতে কলঙ্কিত প্রথাসমূহ লুপ্ত হওয়া সকলের জন্যই মঙ্গল জনক। পুরাকালে এই অসুর বিবাহ ও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রকাশ্য ভাবেই চলিত। ব্যাসদেব বশিষ্ট ভাতৃবধুদ্বয়ের সন্তানের জন্ম দিয়াছিলেন। কুন্তীর পঞ্চ পুত্রই স্বামীর আদেশানুসারে অন্যের উৎপাদিত।

শ্বেত কেতুর মাতাকে স্বামী পুত্রের সুমুখে অন্যে জোর করিয়া লইয়া গেল, স্বামী টু শব্দও করিলেন না। বরং পুত্র জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলেন "ইহা সামাজিক নিয়ম।" এ সমস্ত নারীর কুৎসা ও পুরুষের কাপুরুষতা এবং হীনতার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্মান বা শ্লাঘার বিষয় নয়, তবুও সেকালে নারীর উপর কত নির্যাতন চলিত ইহা তাহার সামান্য উদাহরণ মাত্র। দেড়শত বৎসর পূর্বেও প্রকাশ্যে সতীদাহ প্রথা চলিত। স্বামীর মৃত্যু হইলে সম্পত্তিশালিনী বিধবাকে একবাটি সিদ্ধি পান করাইয়া সহমরণে নেওয়া হইত, সে নেশার ঘোরে হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গাহিত ইহার নাম সহমরণে যাওয়া। তারপর চিতায় লগুর বাঁশের দ্বারা 'সতী'টিকে চাপিয়া ধরিয়া ধূপ ধূনার ধোঁয়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইত—যেন কেহ 'দেবী'র চীৎকার শুনিতে বা যাতনা দেখিতে না পায়। ইহা যদি সভ্যতার নিদর্শন হয় তবে অনেক বন্য জাতি উহাদের অপেক্ষা ঢের সভ্য। আফ্রিকায় ও ফিজিদ্বীপে এক একটা ডাহোমি সর্দারের মৃত্যু উপলক্ষে শতাবধি

বিধবাকে গলায় বাঁধিয়া গাছের শাখায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। উদ্দেশ্য পরকালেও পতিসেবা করিবে। অবশ্য দু একজন স্বেচ্ছায়ও সহমরণে যাইত, কিন্তু সে নিতান্তই অল্প। আত্মহত্যা কি লোকে স্বেচ্ছায় করেনা ? বিশেষতঃ আত্মহত্যায় উত্তেজনা নাই, কিন্তু ইহাতে প্রশংসা ও যশের লোভও রহিয়াছে- যশের ও চিরস্মরণীয় হইবার লোভ মানুষকে কোন্ কাজ না করাইয়াছে! গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপও বহুল প্রচলিত ছিল। ইংরেজগণের বহু চেষ্টায় এসব নারী ও শিশু হত্যা নিবারিত হইয়াছে বটে কিন্তু সে সময় ভট্টাচার্য্যগণ টিকি দুলাইয়া দুলাইয়া বিলাতে এজন্য আপীল করিতেও ছাড়েন নাই।

শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিও বলিয়াছেন "নরকস্য দ্বারঃ নারী।" অন্য একশাস্ত্রে আছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" অথচ এইসব শাস্ত্রকারগণের বিধি মাথা পাতিয়া লইয়াই কোটি কোটি লোক পরিচালিত হইতেছে। কি জঘণ্য মনোবৃত্তি। বেদ পাঠের অধিকারও নারীকে দেওয়া হয় নাই। পিতার কোন সম্পত্তি বা আশ্রয়ও ইহাদের পাওয়ার অধিকার নাই। এই তো নারীত্ব ও মাতৃত্বের প্রতি সম্মান।

নারীর প্রতি সু-বিচার ও সম্মান পাওয়া যায় একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মে। যদিও আধুনিক সমাজপতি এবং বাংলার জনসাধারণ তাহা গ্রাহ্যই করেনা। পূর্ব্বের আরবগণ বকরী বা ভেড়ার পালের ন্যায় অসংখ্য স্ত্রী ও ক্রীতদাসী রাখিত, নারী উহাদের নিকট উপোভোগের জিনিষ ছিল। এই নবধর্ম্মে পুরুষের স্ত্রী বর্ত্তমানেও চারি এবং স্ত্রী লোকের যতবার ইচ্ছা বিধবা বিবাহ হইতে পারে। স্ত্রী বা স্বামী ত্যাগ আছে, তবে যাহার ইচ্ছায় বিবাহ বন্ধন ছিল বা তালাক হইবে তাহারই ক্ষতি। কেননা পুরুষ পত্নী ত্যাগ করিলে সে তিন মাসের খোরাক পোষাক দিতে বাধ্য। আর স্ত্রী যদি স্বামী ত্যাগ করে তবে কিছু না পাইয়াই ত্যাগ করিতে হইবে। কেননা স্ত্রী ত্যাগ করাই পুরুষের জন্য ক্ষতি, এক্ষেত্রে পুরুষ পছন্দ না করিলে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। অথচ পুরাতন পাশ্চাত্য আইনের ধারায় আছে স্বামী যদি স্ত্রীকে

পছন্দ না করে তবে স্ত্রীকে আধ মিনা ওজনের রূপা দিয়া বিদায় কর। আর স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে তবে স্ত্রীকে নদীতে নিক্ষেপ কর।

কি বিচার,—যখন লোকে নারীকে গৃহ শোভা, পুত্তলিকা মনে করিত, এবং বহু স্ত্রী গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত সেই আঁধার যুগে আরবের পূর্ব্বগগনে প্রভাত অরুণ রেখা দেখা দিল। শেষ নবী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপচ্ছটায় ও অসামান্য চরিত্র দ্যুতিতে সমগ্র আরব দীপ্তমান হইয়া উঠিল, তাঁহার ভাস্বর বিভা ক্রমে তুরস্ক, মিশর, রুশ, গ্রীসে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই নব জীবনের কিরণ প্রভাতে – ইতিহাসের সুবর্ণ যুগে দুঃখিতা ও নিগ্রহ পীড়িতা নারী জাতির দুঃখ লাঘবের জন্য ঐশীবাণী অবতীর্ণ হইল—“তোমাকে সুপথে পরিচালিত করার জন্যই এই সমস্ত নিয়ম। আল্লা-তালার কোন বিধান অসঙ্গত নহে, তিনি মহাজ্ঞানী ও বিবেচক। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় যাহাতে তোমরা অবৈধ কার্য্য না কর এবং কেবল অভিলাষ তৃপ্তি করিতে নিযুক্ত না থাক, তজ্জন্য বহু ভার্য্যার স্থলে তাহাদের সংখ্যা চারিজন করিয়াছেন, দুর্ব্বল চিত্ত মানুষের ভার লাঘব করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, (“কোর-আন, সুরা নেসা, ৫ম রুকু)” স্বামীকে আল্লাহতালা কেন শ্রেষ্ঠতা দিয়াছেন তাহার কারণ,—উদ্ধত স্বভাব স্ত্রী শাসন সম্বন্ধে অত্যাচারী স্বামী বা স্ত্রীকে আল্লাহতা'লা দণ্ডিত করেন এবং যাহার উপর অত্যাচার হইয়াছে তাহাকে অনুগৃহীত করেন”। (কোরআন সুরা নেসা, ৬ষ্ঠ রুকু) পিতা, মাতা এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের পরিত্যক্ত ধনে স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই অধিকার আছে, তাহা কম বা বেশী যাহাই হোক না কেন,—ইহা নিশ্চয়ই যে যাহারা পিতৃহীন সন্তানের ধন উদরস্থ করে তাহারা অগ্নিই খায়, এবং শীঘ্রই যন্ত্রণাদায়ক নরকে প্রবেশ করিবে।' (কোনআন, সুরা নেসা) শিষ্টাচারের সহিত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিও ; যে স্ত্রীকে তুমি অবজ্ঞা কর, তাহার দ্বারাও প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে (কোরআন সুরানেসা ৩য় রুকু)—ইসলামে এইরূপ অনুগ্রহ, দয়া ও স্নেহপূর্ণ উপদেশ রহিয়াছে। নারী এবং পুরুষ উভয়কেই সমভাবে

শিক্ষা দেওয়ার বিধি আছে। হজরতের সময় মোসলেম মহিলাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধ করিতেন। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতেন, এবং মোসলেম মাতাগণ যুদ্ধের সময় সেবিকার কাজ করিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, কোরআন হাদিসে পর্দ্দা সম্বন্ধে সতর্ক করা হইলেও কোথাও অবরোধ প্রথার উল্লেখ নাই। বরং তাহার বিপরীত কথাই হজরত স্বয়ং বলিয়াছেন, "তোমার যদি বোরকা না থাকে তবে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইবে, তথাপি—বিশ্বাসিগণের মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে কুণ্ঠিত হইবেনা।"—অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন, তালাক ইসলামের কলঙ্ক ; বিধবা বিবাহ তাই ; কিন্তু যেখানে পতি পত্নীর মনোমিলন হয় নাই ইহজীবনে হইবার নয়, সেখানে তালাক ভিন্ন কি উপায় আছে ? নিত্য কলহের চেয়ে কি তালাক মঙ্গলজনক নয় ? তবুও কোরআনে আল্লাহতালা বলিয়াছেন নিজের সৃষ্ট বিধিসমূহের মধ্যে তিনি তালাককেই সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করেন, যখন গৃহ নরকতুল্য ও পতি পত্নী শত্রুতুল্য হইবে সেই দিনই নিতান্ত অপারগ পক্ষে তালাকের বিধি।

বহু বিবাহ ইসলাম সমর্থন করে, কিন্তু যে পুরুষ সব পত্নীকে সমান দৃষ্টিতে না দেখিবে তাহার প্রতি একের অধিক বিবাহ করা কোরআনে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ রহিয়াছে। বিধবাদের প্রতি হজরত মহম্মদ (দঃ) ও আল্লাহতালা যে সম্মান দিয়াছেন, কুমারী বা সধবাকে পিতৃ ও পতিগৃহে যে মর্যাদা দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। কোরআনে নারীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা, দয়া ও সুশিক্ষাদানের আদেশ দিয়াছেন তাহা অভিনব। ইসলাম পতিতা দিগকে যে মুক্তি পথ দেখাইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়, যে কোন পতিতা তওবা করিয়া সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সমাজের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ থাকিবে না। কোরআন নারীকে পুরুষের সহধর্ম্মিণী, সহযোগিনী, সমশিক্ষিতা ও স্নেহময়ী হইতে উপদেশ দেয়, অবরোধ পীড়িতা দাসী হইতে বলেনা। পুরুষকেও নারীর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও স্নেহশীল হইতে বলে, প্রভু হইতে বলে না।

কিন্তু এসব উপদেশ যেন উলুবনে মুক্তা ছড়ানো। কোরআন হাদিসের উপদেশ যাহারা সামান্য লোকলজ্জার ভয়ে লঙ্ঘন করেন তাহারাই আবার মুসলমান বলিয়া দাবী করেন, লজ্জাও নাই। কথিত আছে যে একদিন এক নারী আসিয়া হজরতের নিকট অভিযোগ করিল "আমার স্বামী আমাকে বিনা দোষে প্রহার করিয়াছেন।" তিনি উত্তর দিলেন"—তুমিও প্রহার কর," তখনই প্রত্যাদেশ হইল "বিশ্বাসী বা মোমেনা নারীগণ কখনও উদ্ধত আচরণ করে না, তাহারা স্বগৃহে চরকা ও পুণ্য কর্ম্ম লইয়াই জীবনাতিবাহিত করে। অপরের ঔদ্ধত্য সম্বন্ধেও তাহাদের ক্ষমাহীন হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।" আল্লাহতালা হজরতের বিচারকে খারাপ না বলিয়া উদারতার সহিত ক্ষমা করিতে বলিয়াছেন'—তবে দুর্বলের পক্ষে ক্ষমা করাও কাপুরুষতা বা শক্তিহীন-তারই রূপান্তর বলিয়া কথিত হয়। এক্ষেত্রে নারীকেও শক্তিময়ী হইতে হইবে। নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নারীকে মুক্ত আলো হাওয়ার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সু-শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সমাজের অবস্থা দৃষ্টে আশা হয় আমাদের এ দুরবস্থা বেশী দিন থাকিবেনা। *

---

* সওগাত ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা জৈষ্ঠ, ১৩৩৬

পর্দ্দা ও অবরোধ

রাজিয়া খাতুন (চৌধুরাণী)

যুগ পরিবর্তন! শব্দ বড় মোহময়। যুগ প্রবর্ত্তকের পদটা আরও লোভনীয়। এই কথাগুলির মোহ কত হুর্ভাগাকে যে মরীচিকা ভ্রান্তের মত বিপথে নিয়েছে তার কোন হিসাব নিকাশ নেই। আজ আমরা অর্থাৎ বঙ্গীয় মোসলেম সমাজও সেই তামস-পথের যাত্রী,—কেন যে এতটা অধঃপতনের পথে এগিয়ে চলেছি তা বলতে গেলে আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি, ও কি হতে চাই তাও বলা দরকার।

সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যায়, মোসলেম মহিলা গৃহিনী, সচিব, সখী, প্রিয়া, শিষ্যা তো আছেনই, বরং শক্তি, অধিকার আরও বেশী, কার্যক্ষেত্র আরও প্রশস্ত। তাঁরা গৃহে কন্যা, জননী, ভগিনী ও গৃহিনী, সমরাঙ্গনে শত্রু সংহারিণী ও শুশ্রূষাকারিণী, ধর্ম্মমন্দিরে উপদেশ দাত্রী,— এই-ই মোসলেম নারীর মহিমামণ্ডিত প্রকৃত রূপ। মধ্য যুগে মোসলেম মহিলাকে দেখি,—গৃহ-কারাবন্দিনী, পুরুষের বিলাস সঙ্গিনী ও সর্ব্বশক্তিহীনা। বঙ্গভাষায় মহিলাদের আদরের নাম "অবলা"। বাকি নামগুলির উল্লেখ না-ই বা করা গেল। সেই বিশেষণগুলি বঙ্গ তথা সংস্কৃত ভাষার ঘোর কলঙ্ক। আমাদের সৎ গুণ হচ্ছে ক্রিমি কীটের মত সন্তান প্রসাব করা, নির্ব্বিচারে সকলের সর্ব্ববিধ হুকুম তামিল করা। আমাদের সম্মুখে আদর্শ উপস্থিত করা হচ্ছে 'বিল্ল-মঙ্গলের" আদর্শ সতীকে—যে স্বামীকে বেশ্যালয়ে বহন ক'রে নিয়েছিল। হুর্দ্দৈব আর কি? কোথায় মাতা খোদেজার মত স্বামীকে ধর্ম্মপ্রচারে উৎসাহ দেবেন, পুণ্যবতী আসিয়ার মত স্বামীর অধার্মিকতার বিপক্ষে সংগ্রামে প্রাণ দেবেন, বীরাঙ্গনা খাওলার মত ধর্ম রক্ষার জন্য জেহাদ করবেন, সকিনার মত স্বামীকে বীরসাজে সাজিয়ে দেবেন, তা নয়—

কু-ক্রিয়াসক্ত স্বামীকে সংযত না করে ঘাড়ে করে বেশ্যালয়ে পৌছাইয়া দেন। হায় সতীর ধর্ম। কি আশ্চর্য্য ধর্মজ্ঞান!

কিন্তু পুরুষের সৃষ্ট এই সব নীতি ও বিধিনিষেধ সুফলপ্রসূ হয় নি। যুগ যুগান্তরের বাধ্যবাধকতা ও নিষেধের ভারে সত্যিকারের নারী আজ দলিতা ও শ্বাসরুদ্ধা। তাই সে চায় আলো ও হাওয়া। পুরুষেরাও দেখে—গৃহকোণে নারী হুকুম তামিল করে, যন্ত্রের মত গায়, বাজায় ও। কিন্তু তাতে মন তৃপ্ত হয় কই? এইসব পুতুলের সাহচর্যে তারাও পুতুলে পরিণত হ'তে চলেছে। তাই তারা চায় সেই চিরন্তনীকে—যে দৃপ্ত, সবল, সতেজ, একনিষ্ঠ প্রেমে সুপ্ত অন্তঃকরণকেও জাগিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু বহু দিনের অবজ্ঞা ও অযত্নে নারীর অন্তর আজ অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। এই জন্যই চারিদিকে সারা পড়েছে—"জাগো ওগো বন্দিনীরা! অবরোধ দূর কর,—শৃঙ্খল চূর্ণকর,—বন্ধন ছিন্ন কর।" সে প্রাণস্পর্শী আহ্বান নারীর অচেতন অন্তরেও পৌঁছেছে। কিন্তু গগণচারিণী পক্ষিণীকে যদি বহুদিন খাঁচায় পুরে রাখা হয়, তবে সে যেমন উড়ন ভুলে যায় নারীরও আজ সেই দশা, সে আজ না পারে উড়তে, না পারে চলতে। সেই পাখা ঝট্‌পট করা এক অপূর্ব্ব কসরত।

নারীও বোরকা ত্যাগ করছে, লজ্জা ছাড়ছে, উন্মুক্ত রাজপথে উন্নত মস্তকে পদাচারণ করছে, পুত্র কন্যা একই শিক্ষা লাভ করছে। বনের প্রাণী ও মানুষের প্রভেদ এইটুকু যে সে খাঁচায় উড়ন শিখতে পারে না। কিন্তু বাইরের আবহাওয়া পেতে হ'লে যেটুকু শক্তি ও শিক্ষার দরকার তা নারী পর্দ্দা রেখেও শিখতে পারে। সুতরাং তাকে অশিক্ষিত অবস্থায় বাইরে ছেড়ে দেওয়া, আর অক্ষম শিশুকে সাঁতার শেখার জন্য পানিতে ছেড়ে দেওয়া একই কথা। তবুও তারা বেরিয়ে পড়ছে।

এখন সবাই বলছেন—"দেশ পবিত্র হ'ল," "সমাজ ধন্য হ'ল"। সত্যি দেশ পবিত্র হয়েছে, সমাজ ধন্য হয়েছে। যে দেশে এমন পুতুল পাওয়া যায়, যে বসতে বললে বসে, উঠতে বললে উঠে,—সে পবিত্র বই কি?

দেশ পবিত্র হোক,—সমাজ ধন্য হোক। কিন্তু ওগো বঙ্গের দীন মোসলেম মহিলাবৃন্দ! আজ আমরা করছি কি? অবরোধ ভাঙ্গতে যেয়ে মহান গুরু ও আদর্শ পথ-প্রদর্শক রসুলের উপদেশ অবজ্ঞা করে,—আল্লাহ তালার অনভিপ্রেত কার্য্য দ্বারা তাঁর অভিশম্পাত শিরে ধারণ ক'রে পরম উপকারী পর্দ্দাও ছিন্ন করে ফেলতেছি। আমরা বহুদিনের পিয়াসী বলে কি মলমূত্র দুষিত পানিও পান করব?

পর্দ্দা কি? পর্দ্দা নারীর শুচিতা ও চক্ষুলজ্জা, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও পবিত্রতা। বাহিরের অশুচিস্পর্শ হতে, শয়তানের পাপ চক্ষু হতে পরিত্রাণের জন্য নারীর একটু আবরণের প্রয়োজন সে আবরণ পর্দ্দা—অর্থাৎ বোরকা। এবং তার রক্ষক যে স্বামী সেই রক্ষকই আজ "যুগ প্রবর্ত্তক" উপাধিটার মোহে নারীকে হাটে মাঠে নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। নির্ব্বোধ মোহ-মুগ্ধাগণ একটু বোঝেনা যে এ উন্নতি নয়, বরং আরও নিম্নস্তরে পতন। গৃহে বরং একজনের মন ভুলাতে হয়, বাহিরে বহুজনের। গৃহের কাজ রাঁধা বাড়া, ঘর গুছানো—বাহিরে দরকার হয় মন ভুলনো-কথা, গান ইত্যাদি। এবং রূপ কি করে উজ্জ্বলভাবে দশজনের চোখের সামনে ফুটে উঠবে তাই শিক্ষা করা। এও কি দাসীত্ব নয়? এই মন-ভুলানো,—এ নারীর বহুদিনের, বহু বেদনার সাথী। এই কাজ তার জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত করতে হয়। এতে সে শ্রান্ত, ক্লান্ত। কিন্তু এ একটু নূতন ধরণের,—শিকারীর এটা নূতন ফাঁদ। যারা শিক্ষিতা, তারাও এই মরণ ব্যথায় মত্ত,—চক্ষু যেন থেকেও নেই। নারীর রূপের মোহেই কারবালার সৃষ্টি করেছে,—স্বর্ণলঙ্কা ভস্ম করেছে,—ট্রয় ধ্বংস করেছে। আধুনিক জগতেও খুঁজলে এরূপ উদাহরণ কত মিলে।

নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে অশুচি দৃষ্টিস্পর্শে অপবিত্র হওয়ার কি প্রয়োজন? একথাও সত্য—আমরা মুক্ত আলো, হাওয়া, শিক্ষা, সবই চাই। আল্লাহতালার সৃষ্ট যা কিছু,—তাতে সবারই সমান অধিকার। পাষাণ কারা চূর্ণ হোক,—অবরোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রক্ত-কেতন উড়ুক। কিন্তু

দাসীত্বেরও রূপান্তর আছে। নির্লজ্জাকে লোকে দাসীর চেয়েও অধিক ঘৃণা করে। কর্ম্মশীলা দাসী যদি হাব-ভাবশালিনী দাসীতে রূপান্তরিতা হয়, তাতে তার গৌরব কতটুকু বাড়ে? আমরা অর্থ ও সামর্থ থাকলে মক্কা, মদিনা, দিল্লী, লাহোর সর্ব্বত্রই যাব,—অর্থ না থাকলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করব,—অবসর সময়ে পার্কে বেড়াব। কিন্তু নির্লজ্জা হয়ে নয়—পর্দ্দা বা বোরকা ছেড়ে নয়। আমরা মুক্ত আলো ও বাতাস চাই—নিজের রূপকে পর পুরুষের উপভোগ্য করতে চাইনা, খোলা গাড়ীতে বেড়াতে আপত্তি নেই, খোলা মাঠে বেড়াতেও আপত্তি নেই,—খোলা শরীরে বেড়াতেই আপত্তি করি। ইহা যে প্রত্যেক মোসলেম মহিলারই অন্তরের কথা তাহা বলা বাহুল্য। *

(মাসিক মোহাম্মদী) ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬ বাংলা, পৃঃ ৬১৮-৬১৯

মুসলিম মহিলার সাহিত্য সাধনা

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

গৃহের কর্ম্মক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত, তাই নারী মাত্রেরই বাইরে কাজ করার স্থান অপরিসর। সময়ও সংকীর্ণ। কিন্তু একথা ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে যে দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, শোভা সম্পদ যা কিছু তা আল্লাহতালা প্রকৃতির কোলে ঢেলে দিয়েছেন। সেই প্রকৃতির সঙ্গে যার যতটা যোগ সে ঠিক সেই পরিমাণেই আনন্দ সম্পদের অধিকারী। ফুল ফল ইত্যাদি যেমন স্রষ্টার স্বাভাবিক দান, বোধ হয় সাহিত্যও ঠিক তাই। যদিও এ কথার সমর্থনের জন্য কোন চিন্তানায়কের মত উধৃত করা যাবে না, তবুও মনে হয় এ খুবই সত্য। অন্তরের এমন সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার সাহস নারীরও থাকা চাই। চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখে মনে হয়, নারী শুধু দেহের খোরাকেই সন্তুষ্ট নয়, মনের খোরাকও সে চায়। আজ যে শুধু এ তৃষ্ণা নারীর মনে জেগেছে তা নয়, এ চিরদিনের—তাই সুদূর পল্লীর কোলে শ্যামল ছায়া ঘেরা কুটীরেও অসহনীয় অবরোধগর্ব্বিতা পল্লীবালার কণ্ঠেও মধুর কবিতা ও গান গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—

"পিঠ পরে পিঠ ঝাঁপা খোপায় কনক চাঁপা
মুখ যেন পূর্নিমার চাঁদ
বাটা ভরা পান গুয়া কর্পূর চন্দন চুয়া
কার আশে পাতে কন্যা ফাঁদ।

এ সব মধ্যাহ্নের অবসরকে আনন্দময় করে কখনো কখনো কর্ম্ম বাড়ীর বিচিত্র কোলাহলমুখর প্রাঙ্গণেও শোনা যায়। কেউ বলেছে—

"শতেক রকমে যদি যোগাও রে মন
পর যে পরই থাকে, না হয় আপন।
অথবা— দিন রাত খাওয়া ভাল ঝাটা আর লাথি
তবুওনা খাইওরে কন্যা সতীনের ভাত।"

এই ধরণের বহু ছড়া পল্লী গৃহিণীদের মুখে শোনা যায়। বোধ হয়, অধিকাংশই তাদের স্বরচিত এবং বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতা ও দুঃখ বেদনার সাক্ষী। এ সব কি দেশ-কাল-শ্রেণী নির্বিবিশেষে মনের ক্ষুধা ও তা মিটানোর চেষ্টা করার প্রমাণ নয়? এই মনের খোরাকের নামই সাহিত্য। একে প্রচার, স্থায়ী এবং সকলের কাছে পৌঁছানোর জন্য সংবাদপত্রের সৃষ্টি। সুতরাং দেখা যায়, সাহিত্য সময় বা শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্তরের ক্ষুধা, একে জলের মতই সর্ব্বগামী করে তুলেছে।

নানা অকাজের বোঝা বাদ দিলেও সন্তান পালন ও গৃহের শৃঙ্খলা বিধান নারীর প্রধান কর্তব্য। একটু কর্ম্মপটুতা ও আলস্যহীনতা থাকলে এ সব গৃহকর্তব্য সমাধা করেও সাহিত্যালোচনার যথেষ্ট সময় হয়। অনেক শিক্ষিত মহিলাও বলেন, লেখাপড়া করার সময় পাওয়া যায় না। সময় যদি না-ই হবে তা হলে কার্পেটের কুকুর বিড়াল তৈরী হয় কি করে? সেলাই অতি প্রয়োজনীয় শিল্প, তবে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজেও সময় নষ্ট হয়। ঐ সব অকাজের গৃহসম্ভারের চেয়ে একখানা ভাল বই লিখলে বা পড়লে লাভ বেশী, কেন যে বুঝতে চান না তা বুঝতে পারি না। ছেলেদের সুযোগ সুবিধা অনেক। মার উচিত গৃহ কর্ম্ম শেখানোর সঙ্গেই মেয়ে যাতে অবসরটুকু পরনিন্দা পরচর্চায় ব্যয় না করে সাহিত্য জিনিষ কি বুঝতে চেষ্টা করে সেই শিক্ষাও দেওয়া। এতে সকলেই যে সরস্বতী হ'য়ে দাঁড়াবেন তা হয়তো নয়। কিন্তু সুযোগের অভাবে যে ফুলটি অকালে শুকায় সে তো এ ক্ষেত্রে পাপড়ি মেলার সুযোগ অন্তত: পায়। হাজারে একটি মেয়েও যদি এই প্রচেষ্টার ফলে মানসিক প্রতিভায় রূপময়ী হয় তাও তো জাতির গৌরব।

মহিলা লেখিকাদের কাছে অনেক বেশী আশা করা যায়। শিক্ষিতা নারী জাতির প্রধান সম্পদ। কেননা সন্তানের জন্য জননীই প্রথম ও উত্তম শিক্ষয়িত্রী। স্বভাবত: নারী ও পুরুষ মানব চরিত্র গঠনের দুইদিক ভাগ

করে নিয়েছে। পুরুষ অন্ন, বস্ত্র ও পুঁথিগত বিদ্যা সন্তানকে দান করতে পারে কিন্তু নারী স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা দিয়ে, এমন কি নিজকে উৎসর্গ করেও সন্তানের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে জাগ্রত করে ও জীবন্ত রাখে। পুরুষ কর্ম্মপ্রবণ, নারী প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ। বিনা মূলধনে শুধু প্রাণ নিয়ে যাদের কারবার তারা যে মানব মনের সুখ দুঃখ ইত্যাদি যত রকম অনুভূতি আছে ও তা সহজে বুঝতে ও অপূর্ব্ব বর্ণ সম্পাতে উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারবে তা বলাই বাহুল্য। মন বুঝে চলা যাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, মানব মনের ঘাত প্রতিঘাতময় কাহিনী, কঠিন পথের দুঃখ বেদনার সান্তনা বাণী, লোকে সেই নারীদের মুখেই শুনতে চায়। *

---

* সওগাত, মহিলা সংখ্যা ভাদ্র, ১ম সংখ্যা ১৩৩৬, পৃঃ ৩৭-৩৮

ইসলামে নারীর স্থান

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

ইসলামের উপর সবচেয়ে বড় অপবাদ আনা হয়েছে, এই যে জীবন পথে চলবার পক্ষে নারী পুরুষের সকল সময়ের সঙ্গিনী, এ সত্য ইসলাম মেনে নেয়নি। নিরপেক্ষ ইসলাম সমালোচকের চোখে কিন্তু এর উল্টো সত্যই উপলব্ধি হয়। নারীর প্রকৃত মর্য্যাদা ইসলামের মত অন্য কোন ধর্ম্মমত কোন দিনই স্বীকার করেনি। প্রাচীন রোমে নারী ছিল পুরুষের ক্রীতদাসীর মত। কুমারী অবস্থায় পিতা, বিবাহিত জীবনে স্বামী, স্বামীর অবর্তমানে পুত্র, বা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয় নারীর রক্ষণাবেক্ষণ করতো। নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতনা। এমন কি স্ত্রীর ধনের উপর পর্য্যন্ত স্বামীর অধিকার থাকতো। প্রাচীন গ্রীসেও ভগিনীদের অবস্থা ছিল তাদের রোমীয় ভগিনীদের মতো। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মমতও নারীর উপর সুবিচার করেনি। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। ছেলে থাকতে সম্পত্তির উপর মেয়ের দাঁত ফুটাবার উপায় নাই। আবার নারী যদি কখনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনীও হয় তবু তাহার নিজস্ব স্বত্ব জন্মে না। অর্থাৎ তার কেবলমাত্র ভোগ দখল করবার অধিকার জন্মে। দান, বিক্রয় করার কোন অধিকার থাকে না। এই সমস্ত ধর্ম্মমতগুলি আবার বহু বিবাহেরও সমর্থন করে। পুরুষ যতগুলি ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারে। আবার খেয়াল মর্জিমাফিক ত্যাগ করতেও পারে। নারীর বেলায় এরূপ অধিকার ঐ সমস্ত ধর্ম্মমত আদৌ স্বীকার করে নি। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরব দেশেও নারীর অবস্থা ছিল ভীষণ শোচনীয়। ধন দৌলতের উপর আরব নারীর কোন অধিকার ছিল না। পুরুষ ইচ্ছা করলে

যত খুশী বিয়ে করতে পারতো, আবার যখন তখন তালাক দেওয়ারও তা অধিকার ছিল। সময় সময় স্বামী স্ত্রীকে সস্পেণ্ড করে রাখতো, এ অবস্থায় স্ত্রী বিয়ে করতে পারতো না। স্বামী কিন্তু অন্য স্ত্রীর সঙ্গসুখ উপভোগে বঞ্চিত হতো না। নারী ছিল আরব দেশে বস্তু পর্য্যায়ভুক্ত। মৃতের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সহিত তাহার পত্নী, উপপত্নী, ক্রীত দাসীদের উপরও উত্তরাধিকারীর মালিকানা স্বত্ব বর্ত্তাত। এইরূপে বিমাতারা স্বপত্নীতনয়ের স্ত্রীতে পরিণত হ'ত। মালিকের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের মাথার উপর একখানি চাদর ঢাকা দিলেই তাদের উপর উত্তরাধিকারী স্বত্ব জন্মাত। একাধিক উত্তরাধিকারী থাকলে এই সমস্ত নারী তাদের মধ্যে বন্টিত হ'ত।

ইসলাম নারীকে এইরূপ প্রাণহীন বস্তুরূপে কখনো কল্পনা করে নি। নারী আর পুরুষ যে উভয়েই সমান, নারীত্বে এই ব্যক্তিত্ব ইসলামই প্রথমে স্বীকার করে নিয়ে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য ধর্ম্মমতের সঙ্গে ইসলামের গরমিল ঠিক এইখানে। ইসলাম এ সম্বন্ধে প্রচলিত, অপ্রচলিত, বর্তমান ও অতীত সকল ধর্ম্মমতের ঠিক এক ধাপ উঁচুতে অবস্থিত।

খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে প্রথম নরনারীর যেরূপ কল্পনা করা হয়েছে তাতে নারীর উপর সব দোষ চাপান হয়েছে। নারী যেন পুরুষকে অধোগামী করবার জন্যই সৃষ্ট, নারীকে এ ধরণের অভিশপ্ত প্রাণীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও ধর্ম্মকর্ম্মে নারীর প্রবেশ নাস্তির নীতি দিয়ে নারীকে একেবারে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস ইত্যাদির ব্যাপারে নারীর বয়কটের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ইসলাম কিন্তু নারীকে বর্জ্জন করবার নীতি কোন দিনই প্রশ্রয় দেয়নি। কোরানেও মানব সৃষ্টির আদিম প্রভাতে যে প্রাথমিক নরনারীর উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কেবলমাত্র নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। পুরুষ নারী উভয়ের কাঁধেই সমান ভাবে দোষ চাপানো হয়েছে এবং প্রার্থনা করা হয়েছে খোদার মঙ্গল বারী উভয়ের উপরই বর্ষিত হয়ে উভয়কে শ্রেয়ের পথে নিয়ে যাক। তা ছাড়া

ইসলাম সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি নারী বর্জন নীতিকে কখনই আমল দেয়নি। নারীর সহিত সম্পর্কযুক্ত গার্হস্থ্য জীবনই আদর্শ রূপে ইসলাম ধর্ম্মমতে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং সামাজিকতার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না। কোরানের পাতায় পাতায় এবং ছত্রে ছত্রে নারীর প্রতি সমবেদনাই ফুটে উঠেছে। পূর্বে আরবদেশে স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য পাগল হলে বর্তমান স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিত। কোরানে এর বিরুদ্ধে রীতিমত আইন জারী করা হয়েছে। কুমারীদের কুৎসা রটনাকারীদের উপর এর চেয়েও কড়া আইন জারী হয়েছে।

স্বামী বা স্ত্রী কেউ কারুর উপর মিথ্যা অপবাদ করলে খোদা তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন, কোরানে এইরূপ মত উল্লেখ রয়েছে। ইসলামে বিবাহ প্রথাও উন্নততর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। আরবদেশে পূর্ব্বে যে যাকে খুশী বিয়ে করতে পারতো। কোরানে বিধান করেন—'মাতা, কন্যা, ভগিনী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, ভ্রাতুস্পুত্রী, ভগিনী, কন্যা, স্তন্যদানকারিণী ও তার কন্যাগণ, স্ত্রীর মাতৃগণ, সৎমেয়ে, পুত্রবধু, এবং এক সঙ্গে দুই ভগিনীকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ।' কোরানে কোন মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিমের স্ত্রীকে গ্রহণ করার রীতিও নিষিদ্ধ হয়েছে। তবে স্বধর্ম্মী কুমারী, যুদ্ধ বন্দিনীকে ইসলামে দীক্ষিত করার পর বিবাহের রীতি সমর্থিত হয়েছে। এই ধরণের কুমারীর যদি কেহ অভিভাবক থাকে তবে তার অনুমতি নিতে হবে। এই কুমারীদের বিয়ে করবার বেলায় রীতিমত মহরানার অর্থ ও স্ত্রীর পবিত্র মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু জোরে বন্দিকৃত কুমারীদের উপপত্নিরূপে রক্ষা করবার সম্বন্ধে কোরান একেবারে বিরুদ্ধ মত প্রচার করেছে। নারীকে ব্যভিচারের দুরদৃষ্ট, এবং কলঙ্কময় নিপীড়িত জীবন থেকে পত্নীর সিংহাসনে উন্নয়ন ইসলামের নারী প্রীতির এবং নারী মঙ্গল বিধানের আর একটি বিজয় কীর্ত্তি। মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে

দেওয়া ইসলাম অবশ্যই মেনে নিয়েছে। পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে পিতা বা পিতামহের পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের বিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ'লে সে বিয়ে সুসিদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে না। এমন কি পিতা বা পিতামহ যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের স্বার্থের ক্ষতিকর বিয়ের ব্যবস্থা করে। কাজির আদালতে সেই বিয়ে নাকচ করতে পারে। এমন ছেলে বা মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের এবিয়ে অস্বীকার করেও চলতে পারে। পিতা, পিতামহ প্রভৃতি প্রকৃত অভিভাবক ছাড়া অন্যের দ্বারা সাধিত বিয়ে বরকনের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইচ্ছানুসারে নাকচ হ'তে পারে। এ সম্বন্ধে ছেলেমেয়ের ক্ষমতা অসীম করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে বহু বিবাহের খুব বেশী প্রচলন দেখা যেত। বর্তমান সময়েও কোন কোন জাতির মধ্যে বাঁধাহীন বহু বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরব ভূমিতে যথেচ্ছ যৌন সঙ্গম চলতো। কোরানে অবশ্য বহু বিবাহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইসলাম বহু বিবাহের ব্যবস্থা করেছে দায়ে পড়ে। বহু বিবাহ দস্তুর রূপে ইসলাম কখনই মেনে নেয়নি। মুসলমানদের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে পুরুষের সংখ্যা কমে যায়। এই সময় নিহত শত্রুদের পরিবার ভূক্ত মেয়েরা নিরাশ্রয় হয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের স্মরণাপন্ন হয়। বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধারের জন্য। যাতে ব্যভিচারের উদ্দাম স্রোতে ইসলাম সেবকদের অধোগামী না করে এইজন্যই কোরান বহু বিবাহের সমর্থন করে গিয়েছে।

বহু বিবাহ সম্বন্ধে কোরান নিম্নলিখিত মত প্রচার করেছে :—

(১) অবস্থা বিশেষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারা যায় (ওহোদ যুদ্ধের পর বহু বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।)

(২) একসঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা চলবেনা। (ইসলাম বহু বিবাহের সীমা রেখা উল্লেখ করেছে।)

(৩) সকল স্ত্রীর উপর সমান ব্যবহার করতে হবে অন্যথায় বিবাহ করার অধিকার নেই।

বিবাহের পর বন্ধন ছেদ অর্থাৎ তালাকের কথা এসে পড়ে। কোরানেও তালাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামীয় তালাকের মূলগত ভাবধারা কিন্তু একেবারে বিপরীত। নরনারীর মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাই উহার মূল উদ্দেশ্য নয়, কেবলমাত্র উভয়ের মধ্যে মিলন যখন অসম্ভব বিবেচিত হয় তখনই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে নিতান্ত দুর্দৈবের মত ইসলাম এই কার্য্যকরী নীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছে। সেইজন্য ইসলাম মানুষের কৃত সকল অপরাধে তালাকের স্থান দিয়েছে সবার নীচে। তালাকের মত জঘন্য কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই।

তালাকের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে ইসলাম কিরূপ সজাগ তা কোরান হ'তে উদ্ধৃত কয়েকটি সুরার নিম্নলিখিত রূপ তাৎপর্য্য হ'তে বেশ বোঝা যাবে।

(ক) "যদি দুইজনের একত্রে বাস করা অসম্ভব বিবেচিত হয়, তা' হ'লে উভয় পক্ষ হ'তে এক একজন বিচারক নিযুক্ত কর। তারা উভয়কে আবার মিলিত করবে।

(খ) যারা শপথ করে বলে আর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করবেনা, তাদের ৪ (চার) মাস অপেক্ষা করতে হ'বে। এই চার মাসের পর আবার যদি তারা স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, তা' হ'লে করুণাময় খোদাতালা তাদের ক্ষমা করবেন।

উপরে যে দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো তা থেকে বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে, ইসলাম বিবাহ বন্ধন ছেদনে কতটা বিরোধী। ইদ্দতের জন্য যে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে তা কেবল প্রাপ্তবয়স্ক নারীর জন্য। অপ্রাপ্তা বয়স্কা নারী তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বিয়ে করতে পারে। ইদ্দতের জন্য অপেক্ষার একটা মূল্য আছে, তা হচ্ছে এই যে স্বামীর ঔরশে যদি সন্তান হয়ে পড়ে, তবে ঔরশজাত সন্তানের টানে পুরুষ আবার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে। তালাক সম্বন্ধে তৃতীয় নিয়ম হচ্ছে এই যে, মুখ দিয়ে দু'বার তালাক উচ্চারিত হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

আবার মিলন ঘটতে পারে। অজ্ঞানতার যুগে মানুষ হরদম স্ত্রীকে তালাক দিত, আবার তাকে নিয়ে ঘরকন্না করতো। ইসলাম মাত্র দু'বার এইরূপ চলতে পারে ব'লে নির্দেশ করে। দ্বিতীয় বার তালাক দেওয়ার পর স্বামীকে হয় চিরদিনের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে হবে, আর না হয় তার আশায় চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলী দিতে হবে। কিন্তু এই চরম সময়েও পুরুষের বিশেষ ধৈর্য্য গুণের পরিচয় দেওয়া দরকার। কোন দাম্পত্য জীবন যদি বাস্তবিকই দুঃসহ হয়ে পড়ে, তবে স্বামী স্ত্রী এবং সমাজ সকলের মঙ্গলের জন্যই সে দাম্পত্য জীবনের অবসান হওয়া ভাল। কিন্তু স্ত্রীকে বিদায় দেওয়ার সময় সদয় ব্যবহারই করতে হবে।

তালাক সম্বন্ধে পঞ্চম বিধি স্ত্রীর মোহরানার পাওনা পরিশোধ। তালাকের পক্ষে এই নিয়মটির দ্বারা আর একটি বাধার সৃজন করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একমাত্র চরম উপায় রূপেই তালাকের প্রয়োজনীয়তা ইসলাম মেনে নিয়েছে। তালাক সম্পর্কে ষষ্ঠ রীতি, নারীরই তালাক দেওয়ার অধিকার। এই রীতি 'খুলা' নামে পরিচিত। দুনিয়ায় অন্য কোন ধর্ম্মে এই ব্যবস্থা নাই, একমাত্র ইসলামই নারীকে এই অধিকার প্রদান করেছে।

মোহরানার দাবী ত্যাগ করে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে। সাবিৎ বিন কেসের স্ত্রী জমিলা স্বামীকে তালাক দিতে উদ্যত হয় এইজন্য যে তার স্বামীকে পছন্দ হতো না। স্বামী অবশ্য তাকে খুবই ভালবাসতো। জমিলা স্বয়ং হজরত মোহাম্মদের কাছে এইরূপ স্বীকার উক্তি করে। পয়গম্বর স্বামী ত্যাগের অধিকার প্রদান করে। জমিলা মোহরানা বাবদ স্বামী প্রদত্ত উদ্যানটি আবার তাকে ফিরিয়ে দেয়। অনেক মুসলিম দেশে এই আইন চল্‌তি আছে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে এই আইন বলবৎ হয়ে উঠেনি। তালাকের সপ্তম নীতি, বিচ্ছিন্ন স্বামী স্ত্রীর বিবাহ সমস্যা। তিনবার তালাক দেওয়ার পর স্বামী আর স্ত্রীর সঙ্গে মিলতে পারে না। অন্য কারুর সাথে বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর বিয়ে এবং আবার বিচ্ছিন্ন না হলে আবার পূর্ব্বতন স্বামীর

সহিত স্ত্রীর বিয়ে হ'তে পারেনা। তালাক প্রদানকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই ইসলাম এইরূপ বিধান আছে। যাতে তালাক নিয়ে কেউ ছেলে খেলা করতে সাহস না পায়।

পূর্ব্বোক্ত তালাক অর্থাৎ স্বামীর স্ত্রী ত্যাগের অধিকার এবং 'খুলা' অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক স্বামী পরিত্যাগ ছাড়া ইসলামী বিধানে আরও তিন প্রকার তালাকের ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় প্রকার বিবাহ বন্ধন ছেদের নাম মুবারত। সুন্নি সম্প্রদায়ভূক্ত মুসলমানদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে! মুবারত রীতি অনুসারে স্বামী স্ত্রী আপোষ করে বিবাহ বন্ধন ছেদ করে। আর একপ্রকার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় আদালতের ডিক্রি অনুসারে। বিবাহ বন্ধন ছেদ করার পঞ্চম নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বে কৃত চুক্তি অনুসারে যে কোন সময়ে স্বামীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে পারে। স্ত্রীর এই অধিকার তাক্উইদ রূপে পরিচিত। নারীর এই অধিকার সামান্য অধিকার নয়। বিবাহ বন্ধন ছেদ করা সম্পর্কে ইসলামী আইন কানুন নিম্নোক্তরূপে সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে।

(ক) সমাজের হিতসাধনের জন্য ইসলাম বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে।

(খ) ইসলাম স্বামীকে যথেচ্ছ তালাক দিবার অধিকার দেয়নি, এ ব্যাপারে নানা রূপ বাধার সৃজন করেছে।

(গ) ইসলাম কিন্তু বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করবার বিরোধী।

(ঘ) মানবতার ইতিহাসে ইসলামই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করবার অধিকার দিয়াছে।

(ঙ) মানবহৃদয়ে নিহিত দুর্ব্বলতার জন্য স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ বিষময় হতে পারে। ইসলাম কুণ্ঠিতভাবে এ সত্য উপলব্ধি করেছে। দু'জন মানুষ চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত জীবন যাপন করবে ইসলাম বিবাহ প্রথার এমন ভাববাদের অবতারনা করেনি। ইসলামের চোখে বিবাহ চুক্তি মাত্র। সুতরাং এই চুক্তির অবসান হ'তে পারে।

ইসলাম বিবাহ ব্যাপারে নারীকে যেমন নানা প্রকার অধিকার দিয়াছে, সম্পত্তির উপরও নারীর দাবী সেইরূপ মেনে নিয়েছে। নিম্নে ইসলামী আইনে মেয়েদের সম্পত্তি দখল করবার অধিকারাধির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল।

(ক) উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে কেহ সম্পত্তি উইল করতে পারেনা।

(খ) প্রথমতঃ মৃতের ঋণ, অন্তেষ্টিক্রিয়ার খরচ, স্ত্রীর মোহরানা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) ইসলাম নারীকে সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করেনি, তবে পুরুষের চেয়ে তার হিস্যা কম করার কারণ (১) পুরুষই বেশী উপার্জ্জনক্ষম, (২) বিয়ের পর স্বামীই নারীর সমস্ত নির্বাহ করে সুতরাং তার খরচ অপেক্ষাকৃত কম।

(ঘ) মৃতের স্ত্রী, মা ও কন্যাগণ সকলেই সম্পত্তির হিস্যা পায়। প্রথমতঃ মা আর স্ত্রীর দাবী, তারপর মেয়ের। এ বেলার পুত্রকন্যার মধ্যে কোন ভেদ রেখাটানা হয়নি। মা বাবা ছেলেমেয়ে, না বোনরাও সম্পত্তির ভাগ পায়।

উত্তরাধিকারের অধিকারে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম মেয়েদের নানারূপ ব্যক্তিগত এবং সম্পত্তিগত অধিকারও স্বীকার করেছে। নিম্নে এসব অধিকারের পরিচয় দেওয়া গেল।

(ক) মা ছেলের ৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এবং যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রক্ষণা-বেক্ষণের এবং অভিভাবকের অধিকারিনী। স্বামী পরিত্যক্ত হলেও নারীর এ অধিকার অব্যাহত থাকে।

(খ) স্বামীর প্রতি যেমন স্ত্রীর কর্তব্য আছে স্ত্রীও স্বামীকে সেইরূপ কর্ত্তব্যশীল থাকতে বাধ্য করতে পারে। স্ত্রীকে স্বামীর আত্মীয় স্বজন হ'তে পৃথক রাখতে হবে এবং তার প্রকৃত ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করতে হবে।

(গ) মোহরানার জন্য স্বামী স্ত্রীর নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ। এই ঋণ দায়ের জন্য স্বামী স্ত্রীকে সমীহ করে চলতে বাধ্য হয়।

(ঘ) ইদ্দতের সময় স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করতে বাধ্য। উল্লেখিত ব্যাপারসমূহ হতে বোঝা যাচ্ছে, ইসলাম মোটেই নারীর উপর অবিচার করেনি। ইসলাম নরনারীর অবাধ সম্মিলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করলেও পর্দ্দা প্রথার আমল দেয়নি। বর্তমানে আমাদের দেশে যে জঘন্য পর্দ্দা প্রথা চল্‌তে দেখা যায় তা ইসলাম সম্মত নয়। ইসলাম যে আব্রুর ব্যবস্থা করেছে, তা নরনারীর উভয়ের জন্য, তবে মেয়েদের প্রতি একটু বেশী আঁটাআঁটির ব্যবস্থা করেছে। সামাজিক জীবনে মুসলিম নারী অতীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। সম্রাজ্ঞী জোবেদা একজন প্রতিভাশালিনী নারী ছিলেন। আব্বাস বংশীয় বাদশাহদের আমলে মুসলিম তরুণীরা ঘোড়ায় চড়ে লড়াই পর্য্যন্ত করতো। মুক্‌তাদিরের জননী ছিলেন আপিল আদালতের প্রধান বিচারপতি। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে শোখাশুহ্‌দা বাগদাদে ইতিহাসের অধ্যাপনা করতেন। ময়ায়িদ তনয়া জয়নাব ছিলেন একজন বড়দরের ব্যবহারী জীব। উম্মায়িদ বংশীয় মহিলাগণ উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য খুব প্রশংসা পান।

মুসলিম স্পেনের গ্রানাডা ও কর্ডোভার নাজহাম, জয়নাব, হামদা, হাফসা, সুকিয়া, মরিয়ম প্রভৃতি মহিলারা জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে সুপরিচিতা ছিলেন। ইসলাম নারীকে পদদলিত করেনি। ধূলিবিমলিন কৃতদাসীর পর্য্যায় হ'তে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান পর্য্যায়েই টেনে তুলেছে। নারীর কদর ইসলাম যে কতখানি উপলব্ধি করেছে তা পয়গম্বর মুখনিঃসৃত একটি মহা বচন হ'তে বিশেষ প্রতিভাত হবে,—বেহেস্ত রয়েছে তোমার মায়ের পায়ের তলায়। *

---

* সওগাত মহিলা সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৪০, পৃঃ ৪-৮

মায়ের শিক্ষা

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

জননীদের সুশিক্ষা সমাজ মঙ্গলের দিক হইতে কতোখানি প্রয়োজন, আশা করি আজ আর তাহা কাহাকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃই এমন বেখেয়াল যে, অনেক স্বতঃ প্রতিভাত সত্যের দিকেও সে সব সময় দৃষ্টি দেয় না, কিম্বা সে সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়া উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে না। এইজন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ঢের দিন আগে হইতেই আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত রহিয়াছে :

মা হওয়া কি সহজ কথা ?
প্রসব করিলেই হয় না মাতা।

কিন্তু যাহা করিলে মাতা হওয়া যায়, তাহার কোন বন্দোবস্ত আজিও তেমন ব্যাপকভাবে দেখা গেল না। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, মুখে যিনি যাহাই বলুন কার্যতঃ আজ পর্যন্ত কেহই কন্যাদের পুত্রদের মতো প্রয়োজনীয় ভাবিতে শিখেন নাই। এইজন্য সবাই যেমন পুত্রগণকে যোগ্য কর্মী, পতি, পিতা ও গৃহ স্বামীরূপে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে পোষণ করেন, কন্যাদের বেলায় তেমন অভিপ্রায় কারুরই মনে জাগে না। ইহাতে সমাজের কতখানি ক্ষতি হইতেছে, তাহা সবারই জানা দরকার। কন্যারা যদি অযত্নে বর্ধিত বৃক্ষের মতো হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তাহারা সহজেই সমাজের বিষ-বৃক্ষ, অন্ততঃ আগাছা হইয়া পড়িতে পারে। এবং ব্যাপার যে সত্য সত্যই এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, শুধু শহরের গোটা কয়েক পরিবারের দিকে নজর না দিয়া, খোলা চোখে সবদিকে একবার তাকাইলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত মাতৃত্বের কবলে

পড়িয়া শিশু ও বালকদের মন ও প্রাণের ভীষণ অপচয় ঘটিতেছে এটা সমাজের পক্ষে একটা মহাবিপদ স্বরূপ। কেন এই বিপদ, তাহা বুঝিতে হইলে স্ত্রী ও জননীর ভূমিকাটা আমাদের পাঠ করা উচিত। আজ যাহারা পতি, কাল তাহারাই পিতা ও গৃহস্বামী। আজ যাহারা শিশু, কাল তাহারাই যুবক, তারপর পত্নীর পতি। পতিই পরে গৃহস্বামী। সুতরাং একথা বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয় যে, শিশু বাঁদর হইয়া গড়িয়া উঠিলে সমাজের অন্তর্গত পিতা ও গৃহস্বামীরাও—গোটা সমাজটাই বাঁদর হইবে। পক্ষান্তরে শিশু শিব, মঙ্গলের প্রতিমূর্তিরূপে গঠিত হইলে সারা সমাজই কল্যাণের প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু শিশুকে গড়িয়া তুলিবে কে? ছেলেপিলেরা প্রকৃত পক্ষে মায়েরই সন্তান। জন্মদাতা পিতা তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় আহরণ করিতেই উদ্ব্যস্ত। শ্রমের অবসরে তাহার স্নেহ আসিয়া সন্তানকে স্পর্শ করে না তাহা নয়, কিন্তু শিশুর দেহ ও মন গঠনের উপকরণ প্রসাদ হইয়া তাহার নিকট হইতে আসে না, আসে জননীর অন্তর ও অবয়ব হইতে। মা যদি শিক্ষিতা ও সুবুদ্ধি সম্পন্না হয়, শিক্ষা ও শুভবুদ্ধির ছোঁয়াচ মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের রক্তের অনুতে অনুতে প্রবেশ করিবে। পিতা শিক্ষিত ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও মাতা যদি অশিক্ষিতা ও কুবুদ্ধিপরায়ণা হয়, পিতা হইতে শিশু বিশেষ লাভবান হইতে পারে না। কেননা জগতের সবকিছুকেই শিশু মায়ের ভিতর দিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্য এবং কিশোরের প্রথম প্রান্ত পর্যন্ত শিশুর উপর মাতার বুদ্ধি, মন ও আচরণের এই প্রক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে। এরপর যদিও সন্তান ক্রমশঃ পিতার প্রভাব সীমার ভিতর অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে চলিয়া যাইতে থাকে, কিন্তু ততদিন সে বাঁদর বা শিব একটা কিছু হইয়া গিয়াছে। পিতার ফুরসৎ বা সাধ্য—কোনটাই হয় না যে, তখন তাহাকে উল্লেখযোগ্যরূপে বদলাইয়া দেয়। কুমোর কাদা তৈরী করে, সেই কাদা চাকে চড়াইয়া যা খুশী বানায়। তারপর সেই প্রস্তুত জিনিসটাকে রোদে শুকাইয়া ভালো মতো নীরস হইলে তাহাকে পনে

পোড়াইয়া ব্যবহারের উপযোগী করে। সন্তানের বেলায় এই পনে পোড়ানো-টুকুই পিতার কর্ম, এর আগেকার সবটাই মায়ের কারসাজি। কাজেই মা যদি শিক্ষিতা ও কাণ্ডজ্ঞানী না হয়, তাহা হইলে বিধাতার দেওয়া রক্তমাংসের জীবন্ত শিশুটাকে চটকাইয়া সে যে পদার্থ বানাইবে, তাহাতে বাবার পছন্দ-অপছন্দের কোন প্রশ্নই আর খাটিতে পারে না—তাহার কাজ তখন শুধু থাকে পদার্থটাকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শক্ত করিয়া তাহাকে সংসারের ছাড়পত্র দিয়া দেওয়া। বাবার এইটুকু মাত্র কৃতিত্বের উপর সমাজের মঙ্গলামঙ্গল কোন মতেই নির্ভরশীল বিবেচনা করা যায় না। মনে করুন, বাবা শিক্ষিত, স্বাস্থ্যজ্ঞানী, আদর্শবাদী, কর্মীপুরুষ, আর মা অশিক্ষিতা, শিশু পালনে অজ্ঞ, জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রতি বিদ্বিষ্টা (কেননা আদর্শ-বাদিতায় কিছুটা দুঃখ স্বীকার অনিবার্য), অন্তত উদাসীন। এই পরিস্থিতিতে একটি সন্তান মায়ের কোলে আসিল। বাবা কার্যতঃ কিছুই নয়, মা-ই তার সব। এই মায়েরই অজ্ঞ মূর্খ মনোভাব স্তন্যধারার সহিত মিশিয়া সন্তানের রক্ত, মাংস, মন গঠন করিতে লাগিল। বাবা যতোটুকু পারিল, শিশুটাকে যত্ন ও রক্ষা করিবার প্রণালী বাতলাইল। কিন্তু মায়ের বিবেচনায় বাবার এই মাতবরীটা একটা বাজে জিনিস। সে তাহাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাহার জন্মমুহূর্তে প্রাণান্তকর বেদনা সহিয়াছে, সেই সন্তানের ভালো মন্দ মা বুঝে না, বাবাই বুঝে। এটা তাহার মনে ধরিবার মতো কথা নয় কোনমতেই। কাজেই শিশুটার উদরে হয়তো দূষিত দুগ্ধ পড়িতে লাগিল; তাতে তাহার পেট ফাঁপিল, ক'দিনেই হয় তো তাহার কান্না চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। কিম্বা বরাত ভালো হইলে দূষিত দুধের বদলে গো-দুগ্ধ এমন অবস্থায় চালানো হইল, যাহাতে তাহার প্লীহা দেখা দিল, লিভার খারাপ হইল। অর্থাৎ সে একটি রুগ্ন শিশু হইয়া বাঁচিয়া রহিল। যখন তাহার কথা ফুটিল, বাবার কাছে যাইতে শিখিল, বাবার জীবনাকর্ষণের প্রতি অশ্রদ্ধা তখন মায়ের কথাবার্তা ও আচরণের ভিতর দিয়া

শিশুর মনে শিকড় গাড়িতে লাগিল। কেননা মা-ই তাহার কাছে সবার উপরে সত্য। মাকে দেখিয়া সে স্বাস্থ্য-নিয়ম পালনে উদাসীন হইল, তাহার স্বভাব নোংরা হইল, রুগ্ন শিশু রুগ্ন বাল্যে আসিয়া হাজির হইল। মার শিক্ষা নাই, বাবার অবসর নাই, কে তার মনোযোগ শিক্ষার দিকে আকর্ষণ করে? গুরুমশাই বা পণ্ডিত সাহেব যখন তাহাকে পাইলেন, তখন সাত বৎসরে পা দিয়াছে। তাহার আগে পাঠশালায় যাওয়ার অভ্যাস করাইতে মায়ের আপত্তি, বাবার সময়ের অভাব—বিশেষতঃ মায়ের সঙ্গে এই নিয়া কলহ করিতে অপ্রবৃত্তি। মোট কথা, গুরুমশাই বা পণ্ডিত সাহেব যখন তাহার ছাত্রটিকে পাইলেন, তখন কাদা ছানিয়া হাঁড়ি বা কলসী গড়া হইয়া গিয়াছে। কাজেই দুই তিনটি বৎসর ধরিয়া তিনি যাহা করিলেন, সেটা শুধু পোড় খাওয়ার আগের শুকানোর কাজ। বাবা বেচারা পণ্ডিতের ঊর্ধতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত গালি বকিয়া ধুইয়া দিলেও তাহার কর্ম ইহার বাড়া কিছুই হইতে পারে না। অর্থাৎ বাবার শিক্ষা, জ্ঞান, আদর্শ, চরিত্র—সবই জলে গেলো, মায়ের মূর্খতাই সন্তানের মাঝে অক্ষয় হইয়া রহিল। পোড় খাইয়া সে হইল মানব সমাজের একটা জীবন্ত উপদ্রব। সমাজের এই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল মায়ের অশিক্ষা। এই জন্যই কন্যার শিক্ষা পুত্রের শিক্ষার চেয়ে সমাজ মঙ্গলের দিক হইতে বেশ দরকারী। কন্যাকে যদি সুশিক্ষা, স্বাস্থ্যজ্ঞান, জীবনাদর্শ প্রভৃতি ব্যাপারে সমুন্নত করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, স্ত্রীরূপে সে স্বামীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হইবে, স্বামী তাহার দ্বারা চালিত হইয়া মানবতার উন্নততর নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইবে। সন্তানের কাছে সে হইবে কল্যাণের উৎস। শিক্ষিতা মাতার সন্তান স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যত্ন-লালিত হইবে; পাঠশালে যাইবার পূর্বেই অভ্যাস ও পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে চমৎকার ও যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে। সামাজিক আচরণ তাহার সুন্দর হইবে; আদর্শের প্রতি তাহার আকর্ষণ জন্মিবে। মানুষের মতো মানুষ হইয়া সে পৃথিবীর বুকে আসিয়া দাঁড়াইবে। মা স্বাস্থ্যতত্ত্ব শোনায়, স্বাস্থ্যের অনুকুল

আচরণে অভ্যস্ত করে, পড়াশুনায় প্রবৃত্তি দেয়, বড় বড় কথা ও সুন্দর সুন্দর ভাবের দিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবসর সময়ে নাচিয়া-গাহিয়া আনন্দ দেয়—এমন মায়ের সন্তান অসুন্দর বা অনুপযোগী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পুত্রের মতো কন্যারও, বরং পুত্রের চেয়ে কন্যারই বেশী সুশিক্ষা হওয়া প্রয়োজন এবং সমাজ মঙ্গলের রচয়িতারূপেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তাই কিঞ্চিৎ গৃহকর্ম এবং সীবন-শিল্পই কন্যাদের শিক্ষার সবচেয়ে বড়ো বা একমাত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া সঙ্গত নয়। স্বাস্থ্য সঙ্গতিময় দাম্পত্য-জীবনের নিয়ন্ত্রতারূপে তাহাদের যৌন-শিক্ষা প্রয়োজন। সমাজের দৃষ্টিকে মহত্তর করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার বড়ো বড়ো আদর্শের প্রতি আকর্ষণ জন্মানোর চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। মানুষের আনন্দ লাভের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবার আশায় নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের শিক্ষাও তাহাদের গঠন চেষ্টায় স্থান পাওয়া আবশ্যক। গৃহ কর্ম ও সীবন শিক্ষা মাত্র স্বামীর কর্তব্যের সহায়ক ; কিন্তু এইগুলি সমাজের ভবিষ্যৎ নর-নারী সন্তানকে শিব ও সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য অপরিহার্য। নারী-শিক্ষাব্রতীদের এ কথা স্মরণ রাখা দরকার। *

---

* সওগাত, মহিলা ২য় সংখ্যা, ১৩৫২, পৃঃ…… …… ।

জাতীয় জীবন সমস্যা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

['জাতীয় জীবন সমস্যা' একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ। পূর্বে ও পরে তার অংশ বিশেষ রয়ে গেল। উদ্ধার করা সম্ভব হল না। 'চিন্তাধারা'র ক্রম বিকাশে লেখিকা যে মর্মস্পর্শী বাণী পঞ্চাশ বছর আগে রেখে গেছেন—তা আজো সমাজ বিজ্ঞানীদের মনোরাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। আর শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রশংসা জানাচ্ছে।]

জীবিকা নির্বাহের অন্য পথ না থাকায় কৃষিই বাঙ্গালী মুসলমানের একমাত্র অবলম্বন। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতীর মধ্যে কৃষি মহাসম্মিলনী হইতে কোন্ জিনিসের কতটা প্রয়োজন ও কত জমিতে কি কি উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহা কৃষকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশে তদনুরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। তাই বাঙ্গলার কৃষকগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন করে ও ক্রেতার অভাবে অত্যন্ত সস্তায় বিক্রি করে। কিন্তু এই ৭।৮ টাকা দরের কাঁচা মালই বিদেশে গিয়া ৫০্ টাকা দরে বিক্রি হয়। ইহার প্রধান কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে কোন জিনিস নিজের রফ্তানী করারও কোন সুবিধা নাই। জাহাজের ভাড়া দিতেই প্রাণান্ত হয়। তার উপর বাণিজ্যশুল্ক ত আছেই। আরও নানা প্রকার নাগপাশ রহিয়াছে। মোট কথা, যাহাতে আমরা উদ্যম ও প্রাণহীন জড় পদার্থ ও অর্থ যোগাইবার যন্ত্র মাত্র হই, তাহাই আমাদের প্রতিপালকগণের লক্ষ্য ও প্রকৃত উদ্দেশ্য। হইতেছেও তাই। মাটি খুঁড়িয়া যাহা অর্জন করি, সেই অন্ন ও বস্ত্র বিদেশীর

হাতে তুলিয়া দেই। নাড়িয়া চাড়িয়া শ্রমার্জ্জিত অন্ন মুখে তুলিব, সে ক্ষমতাও অপহৃত হইয়াছে। কাঞ্চন বিনিময়ে কাঁচ পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করিতেছি। সামান্য কিছু লিখা পড়া শিখিয়াই দেশের লোক শহরে বিলাসিতার স্রোতে ডুবিতেছে এবং দেশের প্রাণ ও শক্তি কৃষকগণকে বিদেশী ও তাহাদের দালালগণের হাতে তুলিয়া দিতেছে। এই অসারতা কিসের লক্ষণ?

দুই শতাব্দী পূর্বে মুসলমানগণই বাদশাহ ছিলেন। তাহাদের তর্জ্জনী সঙ্কেতে আসমুদ্রহিমাচল পরিচালিত হইত। ঐতিহাসিক গণনায় সে নিতান্তই কয়েকদিন পূর্বে। আহার-বিহার, আরাম-আয়েশে এখনও বাদশাহি গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু ভাব ভঙ্গী ও দাসত্বের অভ্যাস দেখিয়া ইহারা কোনদিন স্বাধীন ছিল বলিয়া কাহারও সন্দেহ করার উপায় নাই। পেটের দায়ে ভালমন্দ সব দিকে মাথা ঠুকিয়া অন্ধের ন্যায় দিবা-রাত্রি হাতড়াইয়া মরিতেছে। তবুও অন্ন মিলে না কেন? চীন বল, জাপান বল,—এত শীঘ্র উন্নত হইল কি প্রকারে? তাদের শাসনভার নিজ হাতে। রাজা প্রজার স্বার্থ এক উদ্দেশ্যে। ... ... প্রজাশক্তিতে স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। সেই সংঘাতে দুর্বলের মৃত্যু অনিবার্য্য। আত্মসুখপরায়ন বিদেশীর হাতে দেশ থাকিতে কোনদিনই পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। শাসনভার আমাদের হাতে থাকিলে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য এভাবে নষ্ট হইত না। ঢাকাই মস্‌লিনের ধ্বংসের ইতিহাস কাহারও অজ্ঞাত নাই, মসলিন-শিল্পিগণের আঙ্গুল কাটিয়া দেওয়া কোন্ দেশী সভ্যতার পরিচয়? বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নীলের শোচনীয় পরিণামও সকলেই জানেন। চতুর্দিক হইতে অসংখ্য আইন ও নিষেধের বেড়াজাল আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আমাদের শিল্প বাণিজ্য কৃষি ও ইতিহাস—মোট কথা যা কিছু সত্য ও সুন্দর—সবগুলিকে গলা টিপিয়া মারিবার আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে। সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি আমাদের

উন্নতির অন্তরায়। তবুও বাঁচিতে হইবে। চাই প্রাণ, চাই শক্তি। মানুষের মনে যখন দেশাত্মবোধ জাগে, তখনই তার প্রকৃত মুক্তি হয়।

কথাটা যেভাবেই আরম্ভ করি না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, অন্ন বস্ত্র সমস্যা, অর্থ সমস্যা প্রভৃতি সকল সমস্যারই মূল পরাধীনতা! পরাধীনতার কারণ কি? কারণ আমরা এ প্রকার ঘৃণ্যভাবে জীবন-যাপন পছন্দ করি। দাস-শৃঙ্খল আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে, আমাদিগকে জীবনীশক্তি শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। তাই সহস্র আঘাতেও চেতনা হয় না, নচেৎ কোন শক্তিরই সাধ্য নাই যে জীবন্ত জাতিকে ও সচেতন মানুষকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখে। জগতের সর্বস্থানে মহাজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইটালীতে মুসোলিনী লেনিন ট্রটস্কি ... ...

... ...

ও প্রত্যেক দেশেই যুগপ্রবর্তক . . . . . কিন্তু ভারতীয় বা বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত সমাজহিতৈষী নেতা দেখা যায় না কেন? যে নীরব কর্মী দুই একজন আছেন, তাঁহারাও দারিদ্র্য যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত, আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার অর্থ ও সামর্থ্য নাই, দেশের লোকের অবজ্ঞাই সম্বল। যাহার ঘরে অন্ন নাই, মাতা ভগিনী উপবাসক্লিষ্ট, সে দেশের কাজ করিবে কিরূপে? সমস্ত লোকগুলি আফিং খোরের ন্যায় ঝিমাইতেছে ও মরিতেছে। কিন্তু কেহ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে না। ইহার কি প্রতিকার নাই? এই অসারতা ও নির্জীবতার একমাত্র ঔষধ সুশিক্ষা। যে মুহূর্তে দেশের লোক প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই নেশা ছুটিবে। হিন্দু-ভ্রাতৃগণ তবুও সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অনেকটা বুঝিয়াছে এবং খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছে; কিন্তু মুসলমানগণ! যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই রহিয়াছে দুনিয়ার দশজনের সমকক্ষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার মূল প্রয়োজন সুশিক্ষা অপরিহার্য্য। অতএব

সর্বাগ্রে মুসলমান সমাজের শিক্ষার বন্দোবস্ত করাই সকলের সর্বপ্রধান কর্তব্য। লণ্ডনে কুলি মজুররাও মোট বহার অবকাশে রাস্তায় বসিয়া সংবাদপত্রপাঠে দেশের অবস্থা জ্ঞাত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চাষী মজুর ত দূরের কথা, ভদ্রসন্তানগণও সংবাদপত্রের ধার ধারেন না। এইত দেশের নৈতিক অবস্থা।*

(ক্রমশঃ)

* সাপ্তাহিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ১২ই আশ্বিন ১৩৩৫, ২১শ সংখ্যা, পৃঃ ৩০৪।
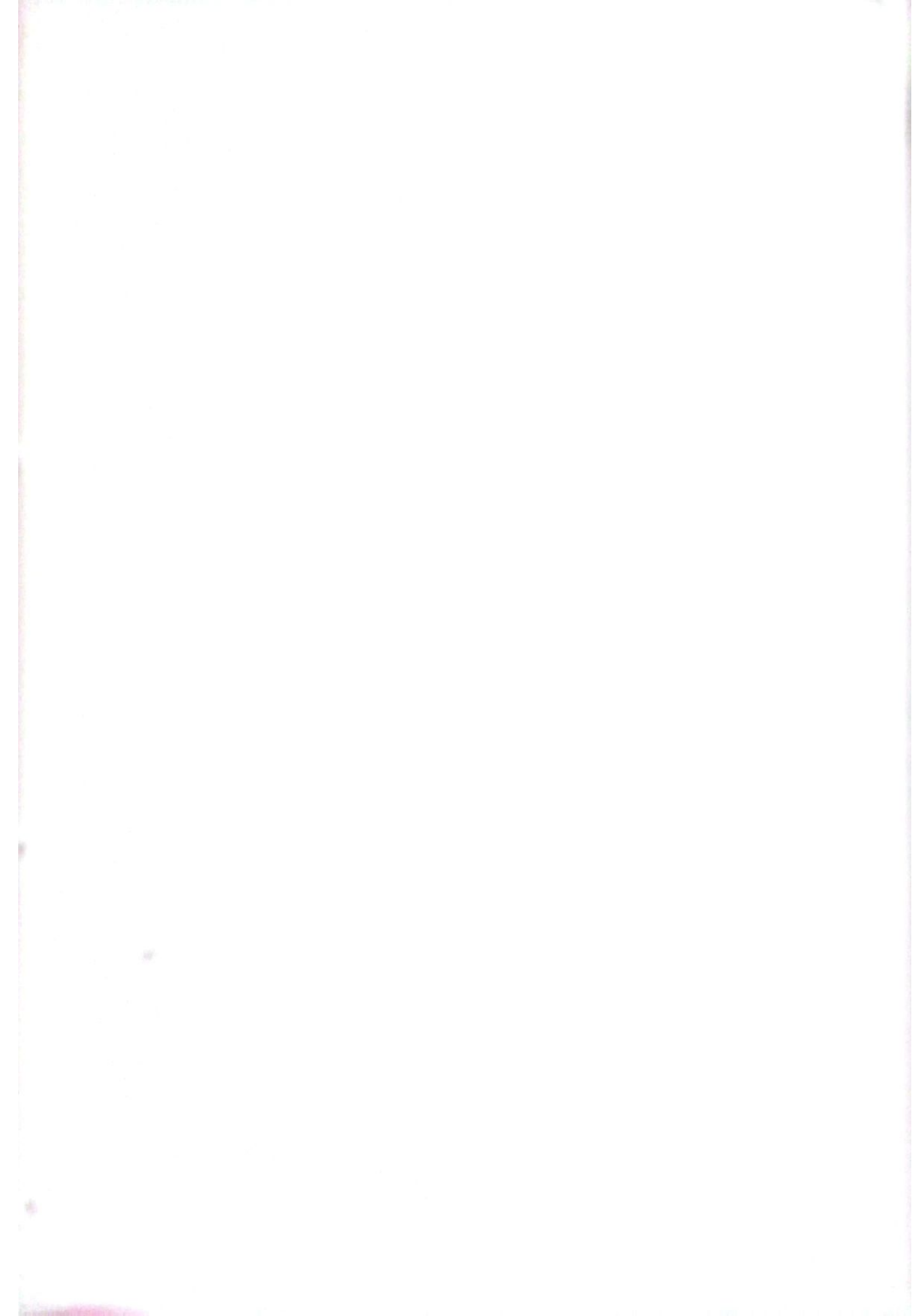
কবিতা

[বহুকাল আগে থেকেই বাংলাদেশে দু'জন মহিলা কবির নাম শিক্ষিত মহলে, শিক্ষাংগণে ও ছাত্র সমাজের নিকট সুপরিচিত। একজন মানকুমারী বসু। ছোটদের উদ্দেশ্যে তার লেখা দু'টি লাইন—

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

আদর্শের এ এক অমোঘবাণী।
তেমনি রয়েছে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর 'চাষা' কবিতার দু'টি চরণ—

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।

গ্রাম বাংলার শ্রমসাধক কৃষকদের জীবন আলেখ্য, জীবন ব্রত এতে প্রতিফলিত।

কবিত্ব প্রতিভায় উদ্দীপ্ত ষোল সতের বছর বয়সের কবির লেখনী-প্রসূত প্রথম কবিতা গুচ্ছ 'উপহার' ১৩৩২ সালে ৫ই মাঘ, মঙ্গলবার, দমদম কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। স্বল্পপরিসর কবি জীবনে প্রতিভার বিচিত্র স্বাক্ষর রেখে গেছেন রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী—প্রবন্ধে, ছোট গল্পে ও অনুবাদে। সর্বোপরি কবি হিসাবেই তিনি সুপরিচিতা। 'চাষা' কবিতা তাকে অমর করে রেখেছে এবং রাখবে।

এযাবত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা মাত্র ১৮। তন্মধ্যে 'উপহারে' প্রকাশিত পাঁচটি আর বাকিগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক

প্রগতিশীল মাসিক সওগাত, নওরোজ, মোহাম্মদী ও অন্যান্য পত্রিকায়। মনে হয় অনুদ্ধারকৃত কবিতা আরো আছে। বেশীরভাগ কবিতা লিখেছেন পয়ার ছন্দে। কোন কোন কবিতা ত্রিপদী ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে। বেশ কয়েকটি কবিতায় সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায় সমর্পণ ও আত্মবিলুপ্তির আকুল আবেদন,—আশেক মাশুকের মিলন কাতরতায় অপূর্ব সুন্দর, আধ্যাত্মিকতায় নিবেদিত। জীবন সংঘাতে বিয়োগ বিধুরতায় মুষড়েপড়া মনের আকুতি ও বেদনাসুন্দররূপে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির বিচিত্র সুন্দর রূপও ফুটে উঠেছে কলমের সুনিপুণ আঁচড়ে।

ভাব ও ভাষা যেমন উচ্চমানের, অলংকার ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কবিতাগুলি কল্পবিলাসী না হয়ে বাস্তবের ছোঁয়াচেই বেশী প্রাণবন্ত, প্রাণস্পর্শী। তাতে কবি প্রতিভার একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। ছন্দমধুর কবিতাগুলি পাঠকের মনে চমৎকার সাড়া জাগায়। কাব্য পিপাসুরা লেখিকার কবিত্বে বিমুগ্ধ হবে বলেই বিশ্বাস।

কবি সুফিয়া কামাল একবার বলেছিলেন, সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর মধ্যেই ছিল সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা।

তৃষা

ঐ কে আসে কোথায় যায়
পলক মাঝে হয় যে লয়
ক্ষণেক জয় আবার ক্ষয়
বিশ্ব কারও আপন নয় ॥
মুক্তি কাঁদে বাঁধন কই ?
কোথায় যাই ? কোথায় পাই ?
বাঁধন বলে মুক্তি কোথা ?
তৃপ্তি নাই তৃপ্তি নাই ॥
কারে খোঁজে নিশিদিন
কোথায় সুর কোথায় বীণ
কোথায় পথ ? কই সে চিন ?
কোথায় আলো ? ফুরায় দিন ॥
বিশ্ব জুড়ে একি তৃষা
কাহার তরে নয়ন জল ?
কোন্ সাহারায় ফুটল ফুল ?
কাহার আশায় সব আকুল ?
কার তরে আজ এ অশান্তি
ক্লান্ত প্রাণ—কারে চায় ?
মুছবে কি সকল ক্লান্তি ?
খোশ বাগের কানন ছায় ॥
হিংসা শান্তি দুনিয়াদারী

সব ভুলে আজ সব ভুলে
কাহার তরে গহনচারী
চাইবে কি সে চোখ তুলে ?
ও বুঝেছি দুনিয়া দিয়ে
আপনা চিনায় দেয় সাজা
সেই ডেকেছে সব ভুলিয়ে
সেই প্রাণারাম—সেই রাজা ॥
তারই মাঝে মুক্তি বাঁধন
সত্য মিথ্যা সবই যে !
যাহার তরে প্রাণের কাঁদন
তারে আজি চিনবে কে !
কোথায় পথ কোথায় সে ?
কিছুই নাই—সব হারা
করবে কি আর পথ দিয়ে
প্রাণের মাঝে সুরধারা ॥
কোন বনে আজ ফুটল ফুল
কোন গহনে বাজল বাঁশি !
গন্ধে সুরে ভাসল দুকূল
ফুরিয়ে গেল কান্না-হাসি ॥*

* উপহারে প্রকাশিত—, ৯।৯।২৪

আত্মার কাঁদন

আর কতদিন থাকব আমি
খেলা ঘরে ?
তোমার আলো আমার প্রাণে
পশবে নাকি কোন ক্ষণে
আঁধার কারায় থাকব আমি
কেমন করে ?

খেলায় আমার কাটল বেলা
কোথায় ডাক ?
তুমি তিক্ত তুমি মধুর
তুমি নিকট তুমি সুদূর
তোমারি ঐ জ্যোতি প্রাণে
জেগে থাক।

সারা জীবন কেটে গেল
দূরে দূরে
সুখের দুঃখের হেলা খেলা
কান্না হাসির ভাঙ্গল মেলা
তবুও কি ডাকবেন ঐ
চেনা সুরে ?
তোমার আমার ভেদ ছিল না
মিথ্যা নয়।
দিলে আমায় একি বাঁধন
দেহ কারায় রুদ্ধ কাঁদন

শোন না কি ? মেয়াদ আমার
হয়না ক্ষয় ?

দিনে দিনে মলিন হল
এই কারা
বল আমি কোথায় যাই ?
মুক্তি কি মোর কোথাও নাই ?
রুদ্ধ ব্যথায় গুম্‌রে মরি
সুর হারা।

কখন আমার মুক্তি হবে
ঘুচবে এই আঁধার ছায়া
কখন তুমি ডাকবে আমায়
ফুরিয়ে যাবে মিথ্যা মায়া।

* উপহারে প্রকাশিত—১৯।৯।২৪

আবির্ভাব

সুন্দর তব আলোক পরশে
হাসল গহন নব-রাগে
আজি দীপ্ত হইল আঁধার চিত্ত
হারিয়ে লক্ষ গুলবাগে।

গভীর তমসা দূর করে আজ
হৃদয়ে আমার জাগল কে?
অন্তরে মোর কি জ্যোতি বিরাজে
কোহিনূর যেন লাখে লাখে।

অন্তরতম! অন্তরে মম
অচল আসন হোক তব
জাগুক সত্য বাজুক হৃদয়ে
তোমারই সুর অভিনব।

হৃদি শতদল আসন তোমার
প্রতিষ্ঠিত হোক চিরতরে—
জ্যোতির্ম্ময় তব মঙ্গল করে
ঘুচাও মলিন অন্ধকারে।

সারাটি সকাল করিয়াছি খেলা
সকল খেলায় এসেছি হারি
সন্ধ্যাবেলায় দু'চোখ ভরিয়া
আনিয়াছি শুধু নয়ন বারি।

তোমারি সত্য জাগুক নিত্য
নব নবরূপে দিবস-রাত
তমসাবৃত জীবন নিশীথে
হোক উদয় নব প্রভাত।*

* উপহারে প্রকাশিত—২২।৯।২৪

মানুষ

সত্যের তরে ফিরে দ্বারে দ্বারে
নিগ্রহ সয়, করে না ভয়,
মরিলেও তার অমর আত্মা
চিরদিন সে যে লভিবে জয়
মানুষ মানুষ চিরদিন ভবে
মানুষ তো পশু নয়।
নশ্বর দেহটা বন্দী করে
এতেই কি সে খর্ব্ব হয়?
ওরে ও পাগল! খেয়ালের দাস
আত্মা কি বাঁধা রয়?
মানুষ, মানুষ চিরদিন ভবে
মানুষ তো পশু নয়!
মনুষ্যত্ব চিরসত্য
সে যে চির অক্ষয়
তাহারে খর্ব্ব করিতে যে চায়
তারই মর্যাদা হইবে ক্ষয়!
মানুষ,—মানুষ চিরদিন ভবে
মানুষ তো পশু নয়।*

* 'উপহারে' প্রকাশিত—২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

বসন্ত

আজি এ প্রভাতে ধীরে অনিল
বহিয়া এনেছে কুসুম গন্ধ
ফুটিছে গোলাপ ফুটিছে বকুল
ফুটিছে গন্ধহীনা সে কুন্দ।
সাজিয়ে এ অর্ঘ পঞ্চপাত্রে
বসন্তের আজি আরতি
পিক্ কণ্ঠে তাই সুধাধারা পলে।
বৈতালিকের ভারতী।
তারকা খচিত সরোবরে চাঁদ
ঢালিছে অমিয় ধারা
প্রকৃতি সেথায় নেহারি আর্সী
ওরূপে আপনি হারা
আজি বসন্তের নিখিল বিশ্বে
পূর্ণ মহোৎসব
সে রূপ বর্ণনে কবির কণ্ঠ
আপনি হারাবে রব।*

* উপহারে প্রকাশিত—১লা ফাল্গুন, ১৩২৭

চাষা

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ-মাতারই মুক্তি-কামী দেশের সে যে আশা।
দধীচি কি ইহার চেয়ে সাধক ছিল বড় ?
পুণ্য অত হ'বে না কো সব করিলেও জড়।
মুক্তি-কামী মহাসাধক মুক্ত করে দেশ,
সবারই সে অন্ন যোগায় নেই কো গর্ব্ব-লেশ,
ব্রত তাহার পরের হিত-সুখ নাহি চায় নিজে,
রৌদ্র দাহ-তপ্ত তন্দ্র শুকায় মেঘে ভিজে।
অস্থি হতেও মূল্য বেশী বুকের রক্ত ঢেলে
শহীদ তুমি, তোমার তুল্য জুড়ি কোথায় মেলে ?
মুক্তি-পথের যাত্রী ওগো-ওগো মহাপ্রাণ,
কোন্ বাঁশীতে শুন্‌লে এমন সর্ব্বত্যাগী তান ?
কোন্ সাহসে কোন্ নাগরাজ বাজায় বিষের বাঁশী,
আহার নিদ্রা সব ভুলেছ, ভুল্‌লে কান্না হাসি,
কোন্ আলোতে অরূপ রূপের প'ড়ল মধুর ছায়া ?
আগুন-হাওয়া সব স'য়েছ, নেই কো দেহের মায়া।
সকল দুঃখের সেরা দুঃখ বহে জীবন ভ'রে,
বিশ্বপিতার দুঃখ-বারি লক্ষ ধারায় ঝরে।
বাদল-ধারায় বেজে ওঠে বিশ্ব-পিতার নাম
স্নেহের দানে ধরণীরই পুর্‌ল মনস্কাম !
ধনী নহে, রাজা নহে, নয় কো সে যে কবি,
তবু দেশের অগ্নি সাধক সে যে দেশের সবি

দারিদ্র তার বর্ম্ম বটে নয় সে কভু দীন,
স্বর্গ রচে ধরার ধূলায় সর্ব্ব বিত্তহীন।
ত্রি প্রহরের কাজের সুরে বেজে ওঠে গান—
আরাম নহে আয়েশ নহে রক্ত ঝরা তান,
সেই সুরেতে সুর মিশিয়ে জীবন করে দান।
এই তো যাদের জীবন-কথা কেমন তাদের প্রাণ?
জন্ম-জয়ী আদি-পিতা যুদ্ধ-জয়ী বীর
দুঃখ-সুখের মিলন-সাধক যুক্ত করে তীর।
একদিকে তার দুঃখ, সেথা অপর পারে সুখ,
মধ্যে তাহার কর্ম্ম-নদী আকুল করে বুক।
কর্ম্ম-স্রোতে জন্ম তাহার মৃত্যু তাহার মাঝে,
কর্ম্ম সনে দুঃখ মেশা একটা সুরই বাজে।
বাজে সে যে রুদ্র তানে বাজে বাদল-বায়,
সেই সুরেতে শ্রান্ত হিয়া তপ্ত ক'রে যায়!
আমার দেশের মাটীর ছেলে করি নমস্কার,
তোমায়-দেখে চূর্ণ হউক সকল অহঙ্কার!
তুমি মোদের সবার নেতা তুমি মহাপ্রাণ,
তোমায় দেখে চূর্ণ হউক ভণ্ড নেতার মান!*

*নওরোজ ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড-১৩৩৪

অঞ্জলী

চলিতে চলিতে যা কিছু পেয়েছি সকলি নিয়েছি তুলি
জানিনা তো প্রভু কোন্‌টি রতন, কোন্‌টি পথের ধূলি।
কোথা ও চোখের নেশা
মোহ মুগ্ধতা মেশা,
কোথা ও পেয়েছি লাঞ্ছনা শুধু, কোথাও পেয়েছি আশা।
কেহ বা দিয়েছে হৃদি নিঙারিয়া অফুরান ভালবাসা!
কারও ভালবাসা ত্বদিনে টুটেছে কারো মোহ,
কারও ছল,
কাহারো হিয়ায় বিকশি উঠেছে
সুন্দর শতদল।
তোমার অপরূপ কান্তি
পরাণে দিয়েছে শান্তি
তোমার প্রেমের পুলক-পরশ হৃদয়ে ফুটাল ফুল
আজ মনে হয় যা কিছু পেয়েছি তুমিই সবার মূল।

o o o o

তোমারি এ দান তোমারেই পুনঃ অঞ্জলী
দিই ভরি।
যদি কলঙ্ক থাকে কিছু তায় নিও পবিত্র করি।*

* মোহাম্মদী ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৌষ ১৩৩৪, পৃঃ ১৬

হতাশের আশ্রয়

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী

সুখে দুঃখে ভরা এই সুবিপুল বিচিত্র সংসার,
তারি মাঝে তৃপ্তিহীন শত কোটি কামনা আমার
হাতছানি দেয় মোরে মোহময় মায়াময় সুরে,
লয়ে যায় তোমা হ'তে বহু দূরে দূরান্তরে মোরে।
তবু যবে সংসারের সুনির্ম্মম কঠোর আঘাত
আমার হিয়ার পরে বজ্রসম বাজে অকস্মাৎ
সেই দিন সব ছেড়ে ছুটে আসি তোমার আশায়,
সব আশা না ফুরালে তোমারে ত মন নাহি চায়!
চাহি আমি ধন জন ঋদ্ধি কীর্ত্তি বিলাস ব্যসন
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি নির্ব্বিচারে করিছ পূরণ।
বুঝিনা ত হে গোপন, কি তোমার অন্তরের ভাষা,
এত দিয়ে প্রতিদানে কেন কিছু কর নাই আশা
দিগন্ত বিথার এই অন্তহীন নৈরাশ্য আঁধার
আছ শুধু চিরন্তন সে আঁধারে আশ্রয় আমার।*

* মাসিক মোহাম্মদী ১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১২ চৈত্র ১৩৩৪ পৃঃ ৩৫২

মাটীর বেহেশ্‌ত

ওরে নিশীথিনী আজ উন্মাদ-পারা হ'য়ে বেভুল
জোৎস্না-সায়র আলোকিত করি
চপল লীলায় দুনিয়াটা ভরি
তিমির বসন পড়িয়াছে ঝরি—
নিজের নগ্ন রূপের নেশায় দোলে দোদুল,
তবু ওগো প্রিয়া, তোমার রূপের নহে সে তুল।
ভালবাসি আমি সুরা ও তরুণী সাকীরে মোর,
তাতে নিশিদিন দিল্ থাকে খোশ
যত নীতিবীদ ধরিবেন দোষ—
কত না ভ্রুকুটি কত সে গো রোষ।
ভালবাসি ব'লে চুরি না করিয়া হয়েছি চোর।
মাটির যে ছেলে মাটিই যে তার অন্তপুর,
দু'দিনের হাসি দু'দিনের মেলা,
তাই বলি সখি থাকিতেই বেলা
ভোগ করে নাও আনন্দের খেলা—
খেলা ভেঙ্গে যাবে নয় কো সেদিন বহুৎ দূর,
থাকেনা সেখানে আলো রূপ শোভা সুরা কি সুর।*

* মাসিক মোহাম্মদী ১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা চৈত্র ১৩৩৪ পৃঃ ৩৫২

শোকাতুরা

তেমনি তো আছে সুন্দর ধরা, কমে নাই কিছু তার
তবুও কেনগো নয়নে আমার ঘনায় অন্ধকার।
বুকের মানিক! দুলাল আমার? গেলি তুই যার কাছে
জানি যেরে ধন, মোর চেয়ে বেশী মমতাও তার আছে।
বুকের এ ব্যথা গোপন করিয়া নিশিদিন রাখি তাই
যার গড়া নিধি তিনিই নিলেন, বলিবার কিছু নাই।
ওই মুখ দেখে দুনিয়া ভুলেছি, ভুলেছি সকল দুঃখ
ছিল না আমার কোনখানে আর অপূর্ণ এতটুক।
স্রষ্টারে ভুলি সৃষ্টি দিয়েই ভরেছিনু প্রাণ মন
তারই প্রতিফলে দিতে হোল বুঝি তোরেই বিসর্জ্জন।
কাকে বলে পাওয়া, কিবা সে হারানো, বুঝাই হয়েছে ভার
তুই কার ছিলি বুঝিতে পারি না, আমার অথবা তার।
সৃষ্টি করিলে তাঁর হয় কিবা কষ্ট করিলে মোর,
চিরদিন তরে যে লইল কোলে সেই কিরে মাতা তোর
মোর ছিলি শুধু দু'দিনের সুখের স্বপ্ন সম
চিত্তের মাঝে অসীম বিত্ত সন্তান মনোরম!
অথবা সে শুধু স্বপ্নও নয় তুই চির সম্বল
ধরায় যা কিছু পুণ্য করেছি তাহারই মূর্ত ফল।
হাজার ফুলের অতুলন শোভা লাগেনিক মোর ভালো
আল্লার দান। অপরূপ রূপে করেছিলি ঘর আলো।
প্রথম আশার প্রথম তৃপ্তি আঘাতেও আদি তুই
তাই দিনু আজ প্রভুরেই তোরে! এ সুখ কোথায় থুই
আর হারাবিনা আর লুকাবিনা, চির মিলনের স্থান
তাঁর কাছে গেলে ফিরে তোরে পাব সেই আশে আছে প্রাণ। *

* মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ পৃঃ ৪৮৯

সেদিন পথের শেষ

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

হে মোর নয়ন আলো !
কি যেন পেয়েছি তোমার মাঝারে কেন যে বেসেছি ভালো !
মণি-মঞ্জীর শিঞ্জিত করি কতজন আসে যায়
কেন যে পরাণ তোমা বিনে আর কাহারেও নাহি চায় ।
ওরা চঞ্চল আলেয়া-আলোক, তুমি মোর ধ্রুবতারা,
দিক ভোলা পথে তোমা পানে চেয়ে পথ পায় আঁখিতারা ।
সাঁঝের ছায়ায় তোমার মায়ায় হ'য়ে আসে একাকার
চলেনা চরণ,—তবুও চলিতে বলিয়াছ বারবার ।।
আশা চায় বাসা, মন চায় সুখ, পথ বলে "চল, চল"
চেয়েছি তোমার পানে হে বন্ধু ! বুঝিনা তো কি যে বল ।
অন্ধকারেও আগে চলিবার তুমি সন্ধানী আলো
তাই ঘরছাড়া পথচলা দীপ বুঝি মোর তরে জ্বালো,
সবে বলে থাম, বিশ্রাম কর-পথ তব তরে নয়,
তুমি বল "চল আরো আগে চল, পথকেই কর জয় !"
শক্তিরও শেষ হ'য়ে আসে তবু চলি চেয়ে অনিমেষ,
তুমি যেইদিন থামিতে বলিবে সেদিন পথের শেষ ।*

* মাসিক মোহাম্মদী ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা পৃঃ ২৭২

ব্যর্থ সাধনা

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

না যায় ধরা ওগো না যায় ধরা,
সবার মরমে তুমি গোপন করা।
যারেই যেমন করে বেসেছি ভালো
তারই মাঝারে দেখি তোমার আলো।
সীমাহীন ওই রূপে চিত্ত ভরা,
না যায় ধরা তবু না যায় ধরা।

না যায় ধরা বঁধূ না যায় ধরা
নব নব রূপ তব চিত্ত হরা
সাধ হয় এ হিয়ায় তোমারে বাঁধি
ব্যর্থ সাধনা—তাই একাকী কাঁদি
মিথ্যা এ নিষ্ফল অশ্রু ঝরা,
না যায় ধরা প্রভু না যায় ধরা।*

* মাসিক মোহাম্মদী ২য় বর্ষ, সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৫ পৃ: ৩৩৫

সাকী

কুঞ্জ বিতানে গুঞ্জন ভরা প্রহর যাইবে কাটি
মধু বসন্ত। ওগো সাকি আজ করোনা করোনা মাটি
অমৃতের সম সুরা ও কাব্য ওষ্ঠে তুলিয়া ধর—
যতটুকু তার অসম্পূর্ণ গানেতে পূর্ণ কর।
ভবিষ্যতের ভাবনা ভুলিয়া দাও প্রিয়া দাও সুরা
এই দুনিয়ায় যা হবার হোক, থাক এ পেয়ালা পুরা
অনুতাপ আর পরিতাপ সবি ফেলে রাখ মিছা সব
হয়ত গো আজই হবে আরম্ভ মিলন মহোৎসব।
পূর্ণ করিয়া দাও ওগো সাকি সুরার পাত্র মোর
যে গেছে বেঁচেছে সকলি মিথ্যা-সত্য এ প্রেম-ডোর।
ফেলে দাও প্রিয়া বর্তমানের ও ভবিষ্যতের আশা
অতীত ভুলিয়া আনন্দ নিয়া দুজনে বাঁধিব বাসা।
আকুল তৃষায় এসেছিনু প্রিয়া বক্ষে ধরিতে তোমা
দেখেছি গো তুমি ধ্যানের মানসী ওগো মোর মনোরমা
তোমারি মাঝারে দেখিয়াছি দেবী, দেখেছি জ্যোতির্ম্ময়ী
মানবীর মাঝে দেবী যে বিরাজে হিয়ার লক্ষী অয়ি।
বুকের মানিক জড়াইয়া বুকে সকল ভাবনা ভোল
ন্যায়ের বাঁধন, যুক্তি তর্ক, মিথ্যার ফাঁস খোল।
রহুক চিত্ত ভরিয়া প্রেয়সী তোমার প্রেমের সুর!
চন্দ্র সমান জাগিব গো, প্রিয়া থাকুকনা যত দূর!
শেষ করো সখী ফেনিলোচ্ছল জীবন পেয়ালা খানি
মৃত্যুর দূত মরণ মদিরা একদিন দিবে আনি।

সেদিন হ'য়োনা ভয়ে কুণ্ঠায় কুণ্ঠিতা তুমি প্রিয়া
মৃত্যুরে কর সুন্দর তব অমর পরশ দিয়া!
মধ্যে সাগর ওপারে মানসী এপারে রয়েছি আমি,
বিরহে তাহার মৃত্যু অধিক যাতনা দিবস যামী।
এপারে তোমার মিলনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি প্রিয়া
ওপারে এ দুঃখ মুছায়ে দিওগো প্রেমের পরশ দিয়া।
পান্থশালার দুয়ারে আমার মাথাটি লুটায়ে দাও
সবার চরণ ধূলা মুছাইব কেশেতে হাসিয়া তাও
চাহিনা স্বর্গ চাহিনা মর্ত তোমারেই চাহি প্রিয়া
জীবন শেষেও শুধু প্রিয়তম তোমার পরশ দিও।
এ ধরাপাত্রে সেই চির সাকি ঢালিছে সুরার ধারা—
বুদ্বুদ-সম ডুবিছে ভাসিছে চন্দ্র সূর্য তারা—
তোমার আমার মত কতজন দিবা রাতি ভাসে তায়,
পূর্ণ পাত্র শূন্য হইতে কভু নাহি দেখা যায়।
খোল খোল দ্বার রয়েছি বসিয়া তোমার করুণা লাগি
দিবস রজনী ও দয়ার আশে নিত্য রহিব জাগি।
ছিল যারা সাথে ধরেছিল হাতে সবাই গিয়াছে চলে
দীন বঞ্চিত লইব মাগিয়া অভয়, নয়ন জলে।
তব সন্ধানে ফিরি যুগে যুগে সারাটি জীবন আমি,
ধনী নির্ধন সকলেই খোঁজে তোমায় জীবন স্বামী।
আছ একান্তে হৃদয় প্রান্তে নিশ্চয় জানি প্রভু,
অন্ধ এ হিয়া তোমার আশায় দূরে দূরে ফেরে তবু।*

* মোহাম্মদী ২য় বর্ষ ১৩৩৫

চাওয়া ও পাওয়া

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

দেখা তুমি দিলে আমায় নিত্য নূতনরূপে
বুঝিনা তা, ভাবি বুঝি আসবে চুপে চুপে।
সেই আশাতে পথের পানে চেয়ে যবে থাকি
তোমার সহজ সেবা সুখে বঞ্চিত হই নাকি ?
তোমার নীরব সাধনাতে মগ্ন থাকি যবে
গৃহ যে হয় মুখরিত তোমার কলরবে।
যাওয়ার পরে চমক ভাঙ্গে, তখন বহুদূর—
চলে গেছ,—বাজে কানে "আসব আবার" সুর।
ভুল ত্রুটি ও খেলার মাঝে এই যে আমার চাওয়া
তারও চেয়ে ব্যথা ভরা বিলম্বিত পাওয়া।
চিনিনা তাই পাইনা সবার স্নেহ মমতায়
নিত্য করি সন্দেহ তাই তোমার ক্ষমতায়
হে মোর প্রিয়, হে মোর প্রভু, তোমারি হউক জয়,
তোমার মাঝে ভুলাও আমায় "আমিত্ব" হোক ক্ষয়।*

* মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৩৬ পৃঃ ৫৫২

তবু আলো ভালবাসি

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

ভরা যৌবনে পান কর সাকি লীলা চঞ্চল সুরা,
কাজ কি জরার আঘাত হইতে জীর্ণ ভাঙ্গা ও চুরা ?
বৃদ্ধ হওয়ার চাইতে কি সাকি ! মরনে আপন জানি
জরার চাইতে মৃত্যুরে এস বন্ধু বলিয়া জানি।

জীবন হইতে শেষ দু'দণ্ডে থেমে যাবে সব খেলা
প্রদীপ নিভিয়া যাবে শেষ হবে হাসি উৎসব মেলা।
আকাশের চাঁদ খুঁজিবে আমায় কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে
তুমি শুধু রবে জীবনে মরণে নিত্য আমায় ঘিরে।

প্রিয়তম, তুমি আছ কিবা নাই কাজ কি বিচারে তার ?
বাদশা গোলাম গণ্ডী ছাড়িয়া সুধারস জানি সার।
সত্য মিথ্যা জানিনা কিছুই, আমি তার, সে আমার
আছ কিবা নাই তারাই ভাবুক, জীবন যাদের ভার।

দীর্ঘ জীবন সাধনা করিয়া কি-বা আমি পাইয়াছি ?
জ্ঞান অঙ্কুর হলনা আজিও, কেমনে রহিব বাঁচি ?
অন্তরে বসে অন্তরতম আশ্বাস দিলে মোরে
'এখন রয়েছ, হয়ত তুমিও রহিবেনা কলে ভোরে।'

মানুষ নিজের আসন ভুলিয়া স্রষ্টা সে হতে চায়
সুধার পাত্র ভঙ্গুর দেহ, আত্মা কোথায় যায় ?
প্রাণের ফাটলে বেদনার ছড়ে বাজাইছেন তিনি বাঁশী
প্রদীপ শিখায় জ্বলি পতঙ্গ, তবু আলো ভালবাসি।*

* মোহাম্মদী ৩য় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা জৈষ্ঠ পৃঃ ৩৭৬

সাধ

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

চাওয়ার অতীত পাওয়ার অতীত ভুবন ভুলানো রূপ,
সকল ভুলায় মোরে,—
মানসে বিরাজে ছায়াহীন কায়া অদ্ভুত অপরূপ,
ভোলি শোক জ্বালা চঞ্চল হিয়া নিশ্চল নিশ্চুপ,
কি যেন মোহের ঘোরে।
শত বসন্ত-রূপ সৌরভ চুরি করা ফুলভার
এ মন ভ্রমর সম,—
উন্মনা হয়ে সহে কণ্টক, ধরা বন-বীথিকার
আঘাতে আঘাতে গুঞ্জন তোলে হৃদয়বীণার তার
ওগো মোর মনোরম।
এই ধরণীর মায়া ক্ষণিকের, জানি এ স্বপ্ন ঘোর,
শুধু দু'দিনের আশা,—
মাটির ধরনী ম্লানমুখে চেয়ে রচিছে স্নেহের ডোর
শতবার করে কাঁদাইয়া মোরে কি আর হইবে ওর।
ও মায়া সর্বনাশা!
নিরুপায় স্নেহ বড় বেদনার, বুঝি বড় অপরাধ,
এ মন মানেনা তবু,—
সাধনার জোর নাহিক আমার, আছে প্রাণভরা সাধ
ধরিতে না পারি ধরা দিতে চাই তাতে সাধিওনা বাদ
অন্তর্যামী প্রভু!

* মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃঃ ৬৬৭।

আকাঙক্ষা

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

হে বঁধূ, দিয়েছি মন দিবস রজনী
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ—মন বক্ষঃ মাঝে
গোপন যে সুরটুকু কেঁপে কেঁপে বাজে—
তারো মাঝে বিরাজিত তুমি মহিমায়।
কল্পনার সুখ-স্বর্গ, আর এ ধরণী,
গুপ্ত যাহা ব্যক্ত যাহা কাছে ও সুদূরে,
মহার্ঘ্য উজ্জ্বল আর যা কিছু মলিন—
দিনের সূর্যের মত নিশায় নিলীন,
কোমল কপোল-লগ্ন শ্বেত অশ্রু জল,
রজনী গন্ধার হিম-সিক্ত করা দল,
সব কিছু সমর্পিয়া তোমার উদ্দেশ্যে
অপলক চেয়ে থাকি কোন্ দূর দেশে !

মেটে নাক অন্তরের অনন্ত পিয়াসা ;
তৃপ্ত নাহি হয় ক্ষুধা, আশা, ভালোবাসা !
এই শুধু জাগে মনে—যেই যবনিকা
তোমার আমার মাঝে দোলে নিশিদিন—
দূরীভূত হোক তাহা ; শুধু প্রেম-শিখা
দোঁহারে আলোকি' থাক নির্ব্বাণ-বিহীন।*

* সওগাত ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৩৬

মরণ সাগর কূলে

মরণ সাগর কূলে বসে
গাহি জীবনের জয়গান।
মরণের পথে বেঁচে আছে যারা—
তাদেরই এ অভিযান।
শুধু হাহাকার, শুধু নাই নাই—
এই তো দেশের বাণী
ক্ষুধা মিটাবার ভার কে লইবে
নিজেরে ধন্য মানি ?
জাগে যদি বাণী সবার কণ্ঠে
চাই বাঁচিবারে চাই
এই নিরন্ন দেশের জন্য
চাই গো অন্ন চাই।
জ্ঞানের আলোকে হাতের প্রদীপ
উজ্জ্বল করিয়া লব—
বুকের আগুনে পথ হবে তব
উজ্জ্বল অভিনব।
সত্য সাধনা সকলের মাঝে
জাগায়ে তুলিতে হবে—
মরণের ছায়া দূরে চলে যাবে
জীবনের জয় জয় রবে।

* জয়া বাংলায় প্রকাশিত

রোবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

[রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেছেন অনেকে। কিন্তু কোন মহিলা বিশেষতঃ মুসলিম মহিলা রোবাইয়াৎ বা অন্য কোন বিশ্ববিখ্যাত কাব্য পঞ্চাশ বছর আগে বাংলায় অনুবাদ করেছেন কিনা জানা যায় না। গ্রামে বসবাসকারিনী রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী কবি প্রতিভার আর একটা অমর স্বাক্ষর রেখেছেন ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াতের কয়েকটি স্তবক অনুবাদে। ভাষা সহজ, সাবলীল ও গতিশীল। ভাবগাম্ভীর্য সংরক্ষণে, ছন্দের নৃত্যতাল প্রবহমান রাখায়, এ অনুবাদ সুন্দর—অনুপম, অনবদ্য। লেখিকার মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক 'নয়া বাংলায়' (৮ম বর্ষের ৩৫তম সংখ্যা, ২৮শে ভাদ্র, শুক্রবার, (১৩৪৮) প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য এখানে সন্নিবেশিত করা হল।

মরহুমা রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী দেশ প্রসিদ্ধ গণনেতা মৌঃ আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেবের সহধর্মিনী। তিনি বিগত ১৯৩৪ সনে জান্নাত বাসিনী হইয়াছেন। তিনি সুলেখিকা ছিলেন। তাহার কবিতা, সুলিখিত প্রবন্ধ ও গল্প সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি জীবনের শেষভাগে রোবাইয়াতের এই অনুবাদকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি তার জীবদ্দশায় এই অনুবাদের কোন কোন অংশ 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'নওরোজ' এ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মৌঃ আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ আলী আহমদ চৌধুরী সাহেব তাহাদের বাড়ীর পুরাতন কেতাব পত্রের সঙ্গে অযত্নরক্ষিত কয়েকটি খাতা আমাকে পাঠাইয়াছেন। তৎসমুদয়ের ভিতর মরহুমার কিছু কিছু লেখার

কোন কোন অংশ পাওয়া গিয়াছে। আমরা পাঠকদের নিকট সেগুলি উপস্থিত করিতেছি। এই সকল কবিতা হইতে মরহুমার অনুবাদ ক্ষমতা ও কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহার লিখার উপর কোন কাটছাট করা হয় নাই। তিনিও নিজের জীবনে সেই সকল কবিতাকে কাটিয়া ছাটিয়া সংশোধন করিবার অবসর পান নাই। ঠিক যেমনটি পাইয়াছি তেমনটিই আমরা উপস্থিত করিলাম। লেখিকার অমৃতঝরা তুলিকার প্রথম স্পর্শ সেগুলিকে যে রূপ দান করিয়াছে লেখিকাকেও তাহার প্রতিভাকে বুঝিবার পক্ষে উহাই তাহাদের স্বাভাবিক রূপ হইবে। সুতরাং সেইভাবেই তৎসমুদয় প্রকাশ করা হইল —।]

(১)

কুঞ্জ বিতানে গুঞ্জন ভরা প্রহর যাইবে কাটি
এ মধু বসন্ত ওগো সাকী আজ করোনা করোনা মাটি
অমৃতসম সুরা ও কাব্য ওষ্ঠে তুলিয়া ধর.
যতটুকু তার অসম্পূর্ণ গানেতে পূর্ণ কর।

(২)

চল সখী চল মম সনে ঐ অজ্ঞাত বন পথে,
বিশাল মরু ভূ-আসন বিছায়ে রহিয়াছে নিজ হতে,
প্রভু ও ভৃত্য সব এক দাম নওশেরা ও আনুতফীর
তব অঙ্গের সুরভি মাখিয়া বহিবে মলয় মন্দ-ধীর।

(৩)

ভবিষ্যতের ভুলিয়া ভাবনা দাও প্রিয়া মোরে রঙ্গিন সুরা,
এ দুনিয়ায় যা হবার হোক থাকনা আমার পেয়ালা পুরা ;
অনুতাপ আর পরিতাপ সখী ফেলে রাখ ও যে মিথ্যা সব,
হয়তো আজই হবে আরম্ভ মিলনলোকের মহোৎসব।

(৪)

পূর্ণ করিয়া দাও সখী সুরার পাত্র মোর,
যে গেছে সে গেছে সবই মিথ্যা সত্য এ প্রেম মোর ;
ফেলে দাও প্রিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশা,
কিছু না ভাবিয়া আনন্দ নিয়ে দু'জনে বাঁধিব বাসা।

(৫)

যুক্তিতর্ক জঞ্জাল নিয়ে কাটে আর কতকাল ?
মিথ্যা ওদের স্বর্গ কুহক, মিথ্যা সে মায়াজাল।
মিথ্যা ভাবিছ ন্যায়ের যুক্তি বক্ষে রাখিয়া ক্ষুধা,
সব ভুলে সখী কণ্ঠ ভরিয়া পান কর সুরা সুধা।

(৬)

× × × × × ×

(৭)

কর্ম্ম কোলাহল মাঝে থেকোনা কেবলি ভুলে,
অবসর করে প্রিয়ারে তোমার নিওগো বক্ষে তুলে।
জীবন যদিবা ফুরায়ে যাবে রহিবে অনন্ত প্রেম
পিতলের মেলায় চিরদিন জেগে রহিবে উজ্জ্বল হেম।

(৮)

আকুল তৃষায় এসেছিনু প্রিয়ে বক্ষে ধরিতে তোমা
দেখেছি গো তুমি ধ্যানের লক্ষ্মী ওগো মোর মনোরমা
তোমারি মাঝারে দেখিয়াছি দেবী দেখিয়াছি জ্যোতির্ম্ময়ী,
মানবী মাঝারে মানসী আমার বিরাজে মহিমাময়ী।

(৯)

বক্ষরত্ন জড়াইয়া বুকে সকল ভাবনা ভুলিয়া যাও,
ন্যায়ের বাঁধন যুক্তিতর্ক ধর্ম্মের জাল ছিড়গো তাও।
রহুক জাগিয়া চিত্ত ভরিয়া প্রেয়সী তোমার প্রেমের সুর,
চন্দ্র পদ্ম সমান জাগিব রহুকনা প্রিয়া যতই দূর ?

(১০)

বাদশা হইলে ওগো প্রিয়তমা বেশী কি হতেম সুখী
তোমার রূপেতে আলোকে হৃদয়, হে মোর চন্দ্রমুখী ;
অমরতা ভরা তোমার সোহাগ অমৃত অধিক জানি।
ফকির হয়েও ভালবাসা তব হে মোর ভাগ্য মানি।

রচনা সংকলন

গল্প

[পরশমনির পরশে লোহাও সোনা হয়ে যায়। তেমনি প্রতিভার পরশ সুন্দর সুশোভন করে তোলে যা কিছু তা স্পর্শ করে। প্রতিভার তেমনি বিচ্ছুরণ দেখা যায় রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর লেখায়। তিনি লিখেছেন প্রবন্ধ, লিখেছেন কবিতা, লিখেছেন গল্প, করেছেন অনুবাদ। বিচিত্র তার গতি।

সংখ্যার দিক থেকে বেশী না হলেও জীবিতকালে সাতটি ছোটগল্পের একটা সংস্করণ 'পথের কাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, কলকাতা মোহাম্মদী বুক এজেন্সী থেকে প্রকাশিত। দুর্ভাগ্যবশত বইখানার কোন হদিস আজ আর পাওয়া যায়না। তাই উহার পূর্ণাংগ প্রকাশ সম্ভব হলনা। যে চারটি গল্প বিভিন্ন মাসিক থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার পুনঃ মুদ্রণ এখানে রয়েছে। সাতটি গল্পের নাম—এক রাত্রি, এ মরু কারবালায়, নারীর ধর্ম, শ্রমিক, পল্লীবধূ, তিন অঙ্ক, মুখের মত'। শেষ তিনটি গল্প উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এ সংকলনে মোট দশটি গল্প রয়েছে। প্রাগুক্ত চারটি গল্প ব্যতীত, ছয়টি গল্প হচ্ছে ঈদের চাঁদ, এপ্রিল ফুল, পিয়াসী, প্রেম ও পুষ্প, রূপহীনা, গল্প হলেও সত্যি'।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে লেখিকার সমকালীন সাহিত্যিক জীবনের পরিসরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত মাসিক ও সাপ্তাহিকগুলির সংরক্ষণের অভাবে শুধু রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীরই নয় অনেক লেখক লেখিকার প্রকাশিত মূল্যবান লেখাই হারিয়ে গেছে অথবা নাজানার অন্তরালে রয়ে গেছে। তাতে যুগ মানসের অনেক তথ্যই বিধৃত ছিল।

গল্প কল্পকাহিনী হলেও বাস্তবের উর্ধে নয়। বরং কল্পনার চেয়ে বাস্তব, অনেক ক্ষেত্রে বেশী রূঢ় ও ভয়ংকর। তারই ছোঁয়াচ রয়েছে গল্পগুলিতে। রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর গল্পগুলি সমস্যা জর্জরিত সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র। এককালীন সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির ক্ষয়িষ্ণুতার করুণ দৃশ্যের পাশেই অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ আত্মীয় স্বজনের শঠতা ও হিংসা বিদ্বেষের ক্রুর প্রতিচ্ছবি নিদারুণভাবে মনকে দোলা দেয়। অন্যদিকে তার স্বচ্ছদৃষ্টিতে কৃষক শ্রমিকের দারিদ্রপীড়িত জনজীবনের দুঃখময় আলেখ্যের করুণ কাহিনী হৃদয়কে দ্রবীভূত করে দেয়। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার মদমত্ততার বীভৎসতা সমাজ জীবনে যে সংঘাত আনে তার দুঃখময় পরিণতির ইংগিতও রয়েছে তার লেখায়। কথার মালায় এ সব সুন্দরভাবে গ্রথিত। উপমান উপমেয়সমৃদ্ধ, বর্ণনসৌকর্যে ছন্দময় লেখাগুলি সাবলীল গতিতে নদী স্রোতের মত অবলীলাক্রমে ছুটে চলেছে, কোথাও হোচট খায়নি।

ছোট গল্পকার হিসাবে তার লেখাগুলি সীমিত পরিসরে অল্প কথায় সংযত সংহতভাবে ব্যক্ত এবং তাতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট এবং তা সার্থক।]

পিয়াসী

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"বাবা! আমায় আজ ফুলতলীর মেলায় নিয়ে চল না!"

"যা, যা, এত বড় ধেড়ে মেয়ের আর মেলায় গিয়ে কাজ নেই, মেয়ে ধিঙ্গি হচ্ছে আর কচি খুকীর মত আবদার বেড়ে চলেছে।

এগারো বছরের মেয়ে পিতার কঠোর বাক্য শুনিয়া জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় চলিয়া গেল।

সুকোমল শৈশবে যেদিন মেয়েটা প্রথম দিনের আলো দেখিল, সেই দিনই তাহার মাতা তাহাকে বিশাল সংসারে একাকিনী ফেলিয়া পরলোকের অজ্ঞাত পথে চলিয়া গেল। পিতা খসরু এক দূরসম্পর্কীয়া ভগিনীর নিকট মেয়েটাকে রাখিয়া আসিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সে আর বিবাহ করিল না। কয়েক বৎসর হাত পোড়াইয়া রান্না করার পর তিন বৎসর হইল সে একদিন মেয়েটাকে লইয়া আসিল। সন্তানবহুল ফুফুর সংসারে সে যে খুব সুখে ছিল না তাহা তাহার সাজ-সজ্জা ও শরীর দেখিয়াই বুঝা যাইত। ঐটুকু মেয়ে ইতিমধ্যেই নিজের ও পিতার রান্না এবং সমুদয় গৃহ-কর্ম্ম করিত, কিন্তু সে পিতার শ্রমের লাঘব করিলেও পিতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিসমূহ প্রস্তর কঠিন হইয়া গিয়াছিল। তাই ফুফুর বাড়ী অপেক্ষা খাওয়া-পরায় সুখে থাকিলেও মেয়েটির মনে সুখ ছিল না। পিতা তাহাকে বাড়ীতে আনিয়াই মিশনারী স্কুলে পড়িতে দিয়াছিল। সে সকালে রাঁধিয়া নিজে খাইত ও পিতার ভাত রাখিয়া স্কুলে যাইত আবার বৈকালে আসিয়া রাঁধিত। বস্তুতঃ পার্ব্বত্য প্রকৃতি ও স্কুলের শিক্ষা এ দুই-এর আবেষ্টনে তাহার চরিত্র বিচিত্রভাবে গঠিত হইয়াছিল।

তাহার জন্মিবার পর মা একটু পানি চাহিয়াই প্রাণত্যাগ করেন, ধরণীতে আর পিপাসার নিবৃত্তি হইল না, তাই বাপ তাহার নাম রাখিল পিয়াস। জন্মাবধি স্নেহ কাহাকে বলে সে জানে না। রুক্ষ কঠোর ব্যবহার না করিলেও স্নেহ করার অবকাশ পাইতেন না। পিতা ও নির্মম প্রকৃতি শিক্ষয়িত্রী Miss Bell তদপেক্ষা রুক্ষ ও কঠোর চিত্তা, সুতরাং এই কঠোরতার মধ্যে যে চরিত্র গঠিত হইল, তাহাকে কোমল কোন মতেই বলা চলে না। সে সুন্দরী শিক্ষিতা হইলেও তাহার মন যেন পাষাণ, সুতরাং তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন প্রস্তরীভূত সৌন্দর্য।

ক্রমে আরো তিন বৎসর কালস্রোতে মিলিয়া গেল। পিয়াস কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিল, কিন্তু তাহার সেই উচ্ছল যৌবন-সৌন্দর্য কানায় কানায় পূর্ণ হইলেও মন বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয় নাই। সেই প্রস্তরীভূত সৌন্দর্য আরো ঘনীভূত হইয়াছে, কিন্তু মনে যৌবনের জোয়ার আসে নাই। ইতিমধ্যে সে Missionary School এর সর্বচ্চো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বহুস্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে কিন্তু এইখানেই পিতার স্নেহ ও বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। সুপাত্র না পাইলে বিবাহ দিবেন না এই তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে একদিন বাসন্তী পূর্ণীমায় পিয়াসের বিবাহ হইয়া গেল। স্ত্রীলোক-শূন্য গৃহে আলো, গান, বাঁশী ও উৎসবের কিছুই হইল না বটে, কিন্তু মানুষ ও বিধাতা এতদিন তাহাকে বঞ্চিত করিলেও আজ সে জিতিল। বিধিদত্ত আলো জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র সে বিবাহ-সভা উজ্জল করিল। পিক-বধূরা মঙ্গল-সঙ্গীতে বনভূমি মাতাইয়া তুলিল। ধরণী কুসুম-সম্ভার ও পত্রসজ্জায় অর্ঘ্য সাজাইয়া নব দম্পতিকে অভিনন্দিত করিল এবং যে যুবকটি তাহাকে বিবাহ করিল, সে প্রাণ ঢালিয়াই গৃহের লক্ষ্মী ও রাণীকে বরণ করিল। সে ছিল চিত্রকর, তাহারও শৈশবে পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে, বিবাহিতা একটি ভগ্নী ছাড়া তাহার আর কেহই ছিল না; বাঁশী বাজাইয়া ও ছবি আঁকিয়াই

আশরাফউদ্দীন চৌধুরী, রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী,
শিশু সালেহা খাতুন ও রাবেয়া খাতুন।

তাহার দিন কাটিত। তাহার মানসী ছিল সমুদয় প্রকৃতি। খাওয়া-পরা পিতার সঞ্চিত অর্থ ও জমি হইতেই চলিত। সে পিয়াসের সৌন্দর্য দেখিয়া সুখী হইল বটে, কিন্তু আপন-ভোলা হইলেও মানব-চরিত্রে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল, তাই সে পাষাণীকে দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমার ঐ আঁকা ছবি ও আমার প্রাণ হ'তে বেরিয়ে এলে কি মানসী আমার? যদি এসেছ তবে প্রাণময়ী হ'য়ে কেন এলে না, আমি কি দিয়ে তোমার প্রাণ সঞ্চার করব?" কিন্তু দুঃখিত হইলেও সে নিরাশ হইল না, কারণ ইউসুফ জানিত যে, প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে অনেক সময়ে পাষাণেও জীবন সঞ্চার হয়।

সন্ধ্যা আগত প্রায়, আকাশ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী একপ্রকার স্বর্ণাভ হরিত-বর্ণে প্লাবিত, পার্ব্বত্য পুষ্পের গন্ধে বনভূমি আমোদিত, বহুদূরে সাঁওতাল ও ভীলদিগের মাদলের শব্দ শুনা যাইতেছে। এই মনোরম সময়ে পার্ব্বত্য-নির্ঝরিনী সমীপে দুইটী নারী কলস ভরিতে আসিয়াছে। দুইটীই নব যুবতী—একটী তন্বী গৌরা, অপরটি ঈষৎ স্থূল, শ্যামা ও সুগঠিতা। উভয়ের পরিধানে দেশী মোটা নীলাম্বরী ও লাল শাড়ী। শ্যামাঙ্গী যুবতীটি চিত্রলেখাবৎ গৌরী সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুই আমার ভাইকে ভালবাসিস্ না?" সুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "তুই ভালবাসার অভাব কোনখান্‌টায় দেখলি?" সে উত্তর দিল সে পিয়াস ও অপরা ইউসুফের সহোদরা। সে আবার বলিল, "কি জানি, আমার কেমন কেমন বোধ হয়। ভালবাসার যে একটা আবেগময় উচ্ছাস ও প্রাণ তা তোদের মধ্যে নেই, এই উচ্ছাসই পরে সংযত হ'য়ে স্নিগ্ধ প্রেমে পরিণত হয়। পিয়াস বলিল, "তোমরা ভাই বোন দু'জনেই কবি"! বলিয়া বৃহৎ কলস তুলিয়া লইয়া পার্ব্বত্য পথে অবতরণ করিতে লাগিল—অপরাও তাহার অনুসরণ করিল।

ইউসুফ পাষাণীর স্বপ্ন ভঙ্গের আশায় বহুদিন অপেক্ষা করিল, কিন্তু তাহার আপ্রাণ সাধনা প্রেমেও পাষাণ গলিল না। সেবা যত্নের ক্রুটি হইত না তবে যাহা প্রাণ সেই ভালবাসাই ছিল না। অবশেষে ইউসুফ স্থির করিল প্রেমে যাহা হয় নাই, স্নেহ, বাৎসল্য ও মাতৃত্বে তাহা হইবে। এক বৎসর গত হইয়াছে, পিয়াস এখন সন্তানের জননী, কিন্তু ইউসুফ যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা হইল না। পিয়াস সন্তানকে ভালবাসে সত্য – সে ভালবাসা সম্পূর্ণ উচ্ছাস-হীন, ইউসুফকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করে, তবে সে স্নেহ, স্নেহ মাত্র, বন্ধু বা স্নেহপাত্রকে লোকে যতটা ভালবাসে ঠিক ততটাই। প্রণয়ীর প্রতি যে প্রেম তাহা ইউসুফের ভাগ্যে ঘটিল না। রূপকথার রাজ-কন্যা জানিল না যে কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে সে ঘুম ভাঙ্গিবে। কে জানে এই নিরানন্দ সংসারে হতভাগ্য ইউসুফ থাকিবে কোন আশায়—তাই এক জ্যোৎস্না রাত্রে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাখিয়া গেল দু'ছত্র লেখা "পাষাণ প্রতিমা তুমি শুধু মানসীই রহিলে। যদি কখনো প্রেয়সী হও তবেই ফিরিব, নচেৎ আর ফিরিব না—এ ছন্নছাড়া লক্ষ্মী-শূন্য জীবন গিরি-প্রান্তরেই শেষ হবে।" "ভাগ্যহীন ইউসুফ।"

সংবাদ পাইয়া পিয়াসের পিতা তাহাকে লইতে আসিল, কিন্তু পিয়াস গেল না; দুঃখে কষ্টে যে ভাবেই হউক সে নিজগৃহে থাকিবে, ইউসুফের সন্তান লইয়া অপরের গলগ্রহ হইবে কেন? প্রতিবেশিগণ যথাসাধ্য দেখা শুনা করিতে লাগিল, সে সেই স্থানই রহিল। পুত্রটিকে লালন পালন ব্যতীত তাহার সারা জীবনের আর কোন অবলম্বন রহিল না। তিন বৎসর পর একদিন অত্যন্ত ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। ভূমিকম্প হইলেই পার্বত্য প্রদেশে ধস নামিত। পিয়াসের মনে অমঙ্গলের ছায়া পড়িল। সে পুত্রটিকে ও একখানা ডায়েরী ননদিনীর নিকট রাখিয়া আসিল এবং বলিল "মোতিয়া সে ফিরে এলে তাকে বলিস্ পাষাণ গলে সুশীতল বারি হইয়াছিল, কিন্তু চাতকের আর খোঁজ পাওয়া গেল না, আর বইখানাও দিস।" মোতিয়া হেয়ালীর কিছু না

বুঝিয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিল এবং পিয়াসকে দু'এক দিন রাখিবার জন্য সাধা-সাধনা করিল, কিন্তু সে রহিল না। সেই রাত্রেই চন্দ্রা উপত্যকায় প্রায় বিশ ত্রিশখানা গৃহ লইয়া মাটি ধ্বসিয়া গেল। পিয়াসের কোন চিহ্নও রহিল না, রহিল শুধু বিরাট গহ্বর ও অসীম শূন্যতা।

আরো এক বৎসর পরে বহু দূরের পথ হইতে এক পথিক চন্দ্রা অভিমুখে আসিতেছিল, তাহার দেহ শীর্ণ হইলেও দীর্ঘ ঋজু ও উন্নত সুন্দর। ধূসর সন্ধ্যায় চন্দ্রায় পৌঁছিয়া সে বিরাট গহ্বর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তৎপর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! ইউসুফের স্ত্রী পুত্র কোথায় আছে জান?" সে উত্তর দিল, "তার বোনের বাড়ীতে জিজ্ঞাসা কর।" মোতিয়া চন্দ্রার পার্শ্ববর্তী সমুদয় অধিবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি ইউসুফের স্ত্রী পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যেন পিয়াসের মৃত্যু সংবাদ না দিয়া তাহার বাড়ী দেখাইয়া দেয়। যদি বধূর মৃত্যুতে ভ্রাতা আবার বিবাগী হইয়া যায়। সন্ধ্যায় ইউসুফ মোতিয়ার গৃহে পৌঁছিল। মোতিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রথমেই চমকিয়া উঠিল। তৎপরে বলিল "কোথা হতে এলে ভাই?" ইউসুফ তাহার খোপায় ধরিয়া নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিয়াস কোথায়?" মোতিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "কাল তার বাপের অসুখ সংবাদ পাইয়া দেখতে গিয়েছে, তুমি খাওয়া-দাওয়া কর।" সেই সন্ধ্যাতেই মোতিয়া ভ্রাতাকে স্নান করাইয়া সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইল, খাওয়ার পর ইউসুফ শুইতে গেল।

শুইয়া শুইয়া সে পিয়াসের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার হৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছিল কিনা তাহাই ভাবিবার কথা। যদি না হইয়া থাকে তবে সে আবার নিরুদ্দেশ পথে যাত্রা করিবে। সুখহীন সংসারে থাকিয়া কি লাভ হইবে? এমন সময় মোতিয়া শিয়রে বসিয়া চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চাপা সুরে বলিল, "তুমি কি পিয়াসের বিষয়ে কিছু শুনেছ ভাই?"

ইউসুফের অন্তর আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

মোতিয়া ধরা গলায় কহিল, "সকলে একদিন যাইবে ভাই, পিয়াসও আমাদের ছেড়ে গিয়াছে!" বলিয়া একখানা বাঁধানো খাতা ইউসুফের হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পিয়াস তার সহপাঠিকা ছিল। তাই ভ্রাতৃবধূ হওয়া সত্বেও নাম ধরিয়া ডাকিত, সেও পিয়াসকে কম ভালবাসিত না। ইউসুফ অশ্রুশূন্য জ্বালাময় দৃষ্টিতে বাহিরের জ্যোৎস্না প্লাবিত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া রহিল! এমনই এক ফাগুনী পূর্ণিমায় সে পিয়াসকে পাইয়াছিল। খাতাখানা খুলিয়া সে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখ উল্টাইয়া পড়িতে লাগিল—দেখিতে হইবে পাষাণে দাগ পড়িয়াছিল কিনা। সব লেখাটাই পিয়াসের মৃত্যুর এক বৎসর আগের।

১লা বৈশাখ—সে গেছে আজ কতদিন হইল। মনে হয় যেন যুগ যুগ আমি তার বিরহিনীপ্রিয়া—তারই প্রতীক্ষায় আছি। বৈশাখ এলো তার তপস্যাপূত রুদ্র রূপ ও গৌরিক বাস নিয়ে যেন আমারই অন্তরের প্রতিচ্ছবি। রৌদ্রবরণ তাহার দেহ, শিরে পিঙ্গল জটাভার কিসের সাধনা এ? বুঝেছি সেও অসীমকে চায়। অসীম ও অসীম মিলন কি অসম্ভব? যদি তাই না হয়, তবে তোমার আমার মিলন কেন অসম্ভব হবে? জানি একদিন তুমি আমায় চেয়েও পাওনি। আজ কি তারই শোধ তুলছ। তুমি অধীর প্রতীক্ষায় আমার পথপানে চেয়ে রয়েছ, আর আমি হায়াত তটিনী বা নির্ঝর কূলে বসেই অপরাহ্ন কাটিয়েছি, আর একটি বার ফিরে এস, দেখবে তোমার পাষাণীও কত ভালবাসতে জানে!

১লা জ্যৈষ্ঠ—বৈশাখের তপস্যা-পূত তপ্ত দেহ ক্রমেই স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে, দয়িতের মিলনলিপি পেল কি ধরণী? সে কিসের আশায় এত চঞ্চল? তার কিকে রুয়া শাড়ীর রঙ ধরে উঠেছে কিসের প্রতিক্ষায়, কার আসার আশায় এ বাসর সজ্জা? তুমি আসবে নাকি ফিরে? তা হ'লে আমি ত নতুন সাজে সাজব না, নীলাম্বরী আমার অঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করবে, কর্ণে ধানের গুচ্ছ ও ঝুমকা ফুল, কণ্ঠে শেফালী মালা, হস্তে যুথী মালতীর মালা? ও

রক্তোৎপল আবরণ আরও সুন্দরী করে তুলবে, তোমার জন্য নিত্য নতুন মালা গাঁথব, শুধু ফিরে এস !

আষাঢ়-শ্রাবণ—তোমার প্রতীক্ষায় চোখের জলের শ্রাবণ এলো, ধরণী তার প্রিয়তমকে পেয়েছে, সহস্র ধারায় অসীমের স্নেহ অ-সীমের বুকে এসে পড়েছে, এই স্নেহের পরশটুকু যে সত্যিকার পাওয়া। তাই ধরণী সবুজ শাড়ীটা পরেছে, কর্ণে সবুজ ধানের তরুণ শীর্ষ, অশোক-শীষে, কুরুবকে, যুঁই-বেলায় সে মহিমময়ী রাণী সেজেছে। আর আমার চোখের ঐ পুঞ্জীভূত মেঘের আকারেই ঘনিয়ে উঠেছে, শ্রাবণের ধারাও তার কাছে হার মানে। তোমার আসা কি আর হবে না ? তুমি নিজ হাতে যে কুঞ্জলতা লাগিয়ে গিয়েছ, তা তোমার কুটিরকে পুষ্প স্তবকে সাজিয়ে নয়নাভিরাম করেছে, কে দেখবে ?

১লা ভাদ্র—ভাদ্রের গুরু গম্ভীর স্নিগ্ধ মধুর দিনগুলি ধরার বিরহকে দুঃসহ করে তুলেছে, অসীমের বিরহ ও গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকে তুঙ্গ গিরির শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, ময়ূর ময়ূরীর মত মাতালের বনভূমি আলোকিত, কিন্তু আমার হৃদয় যে অন্ধকার ! তোমার প্রতিপালিত হরিণ-শিশু যৌবনের তারুল্য ও সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে সঙ্গিনী খুঁজে বেড়াচ্ছে ; ঝরণার চঞ্চল গানে তোমারই গানের পদগুলি আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,—

"পথ হতে ফিরে এস হে নিঠুর প্রিয়,
তোমার মধুর পরশ বঁধূরে দিও" !

নিজে যা গেয়ে গেছ, তা যে একদিন আমারই প্রাণের সুর হয়ে উঠবে তা কে জানত ?"

১লা আশ্বিন—আজ সব পথিক বঁধূরা গৃহে ফিরে আসছে। আমার আঁখি-পাখী তারই মাঝে উদভ্রান্ত হয়ে কা'কে যে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোথায় সে ? বনানীর শ্যামল শোভায় দশ দিক আলোকিত, আকাশের নীলিমায়,

বনের শ্যামলিমায়, নদীর কালো জলে কার রূপের পরশ লাগে? ওগো কার অভিশাপে বিরহ আমার হ'ল অনন্ত কালের সাথী?

কার্তিক-অগ্রহায়ণ—"হেমন্তের শিশির ভেজা রাত্রি কোন বিরহিনীর অশ্রু নিয়ে এসেছে? পৃথিবী জুড়ে একি কান্না? ভীল-পল্লী দীপান্বিতার উৎসবে আলোময়, আমার মনে কেন এত আঁধার? একটি ছোট্ট পাখীর ছানা বন হতে কুড়িয়ে এনে পুষলাম, সেটি কাল পালিয়ে গেল। মানুষও বুঝি ঐ রকমই।

আমার চোখের জল কি শুকাবে না? যেদিন জীবন আমার ফুরিয়ে যাবে; সেদিন শেষের আলো-ছায়ায় আসবে কি তুমি? আমার আকাঙ্খিত বাণী, রুদ্ধ বেদন, বঞ্চিত ব্যথা রেখে যাবো এই ধরণীরই বুকে। চাতকের কান্নায়, ফসলের প্রতীক্ষায়, ধরণীর বিরহে সর্বত্রই থাকব আমি জেগে।

ফাল্গুন-চৈত্র – পিক বধুর আহ্বানে বনভূমি প্রাণ পেয়েছে শিমুল পলাশ রক্ত কবরীতে আগুন লেগেছে, আম গাছের কচি পাতা বেতাল শিশুর মত বাতাসের সাথে খেলা করছে। আজ বর্ষশেষ বুঝি বা আমার জীবনেরও শেষ! আশঙ্কায় মন অন্ধকার হয়ে উঠেছে, তাই ছেলেটিকে রেখে এলাম, যদি কখনও মোর প্রিয়তম, তবে এই জায়গার মাটিকে স্পর্শ করে যেও।

জীবনে আমার ধন্য হবে। . বিদায় ধরণী আমার, বিদায় অসীম আকাশ ও শ্যামল বনভূমি, তোমার বুকেই আমার শেষ স্পর্শ রেখে গেলাম।'

ডায়েরী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি শেষ হয়ে এলো, যখন ডায়েরী শেষ হলো, তখন পূবাকাশে অরুণোদয়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। ইউসুফ বইখানি নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল।

রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন অথবা গভীর নিশায় কেউ কেউ পথ চলতে চলতে শুনতে পেত সুমধুর নারীকণ্ঠ 'পথ হতে ফিরে এসো, হে নিঠুর প্রিয়, সোনার মধুর পরশ বধূরে দিও'। লোকে বলত, চন্দ্রা উপত্যকায় পিয়াসের বিরহী আত্মাই প্রতীক্ষায় আছে। তারা সেই উপত্যকার নাম দিল 'পিয়াস'।

—o—

একরাত্রি

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

আষাঢ়ের দারুন গুমট ও অসহ্যগরমের যন্ত্রণায় বারান্দার দরজাগুলি খুলে দিয়ে মাটিতেই একটা পাটি পেতে শুয়ে পড়েছিলুম। একটু শির শিরে হাওয়া লাগতেই ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ চোখের উপর একসঙ্গে অনেকটা আলো এসে পড়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে দেখি চতুর্দশীর চাঁদ ঠিক চোখের উপরে। আকাশে ভাঙা ভাঙা সাদা কালো মেঘে মিলে একটা স্বপ্নপুরী রচনা করে তুলেছে। কত অপরূপ পুষ্পমাল্য শোভিত প্রাসাদ তোরণ বিচিত্র সজ্জা শোভিত বিপুলাকায় হস্তী ও জ্যোৎস্নাস্নাতা রূপসীর কালো কেশের অপরূপ দ্যুতি, চকিত কটাক্ষের চপল চমক এবং লীলায়িত গতির ললিত ছন্দ মনের কোণে মায়াজাল রচনা করতে লাগল। সহসা সব মিলিয়ে অভ্রলেহী বিশাল গিরিরাজ শিখর উন্নত করে দাঁড়াল। সেই বিরাট ও মহিমময় দৃশ্য দেখে মনটা ভয়ে কেঁপে উঠল. তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে চোখ দু'টো বন্ধ করে ফেললুম। একটু পরেই গরমের আতিশয্যে উঠে বারান্দায় দাঁড়ালাম। সমস্ত বাড়ী নীরব নিস্তব্ধ, শুধু বাঁশঝাড় ও বড় গাছের মাথাগুলি শন্ শন্ শব্দে নড়ছে। পুকুরের অতল কালোজল চাঁদের ছায়া বুকে করে হাসছে। সেই দোলা ও হাসি যেন এক রহস্যময় রাজ্যের আভাস দিয়ে যাচ্ছে। মৌনা ধরণী উন্মুখ হয়ে আকাশের পানে চেয়ে আছে। আর আকাশের অসীম স্নেহ মেঘের আকারে পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে। কত দূরে এই আকাশ আর ধরণী। তবুও তারা হাসে, আর চিরদিনই নিত্য নতুন ভূষায় সাজে। মোটের উপর আজকের রাত্রিটাই যেন আমার জন্য নতুন রহস্য ও অনাস্বাদিত মাধুর্যের স্বাদ নিয়ে এসেছে। আরও কতদিন রাত্রি

দেখেছি। কিন্তু কই তার এমন রূপ তো দেখিনি। সহসা একটা মধুর সৌরভ বাতাসে ভেসে এল। বাড়ীর পশ্চিম কোণে একটা পোড়ো জমিতে নানা রকম গাছ জন্মেছিল। সেইখানেই হয়ত কোন বন্য ফুল ফুটেছে মনে করে স্তব্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইলুম। একবার মনে হলো গিয়ে দেখি ওখানে কি আছে। কিন্তু এতরাত্রে সাহস হল না, ভূতের ভয় ছোটকাল অবধিই নেই। কতদিন আষাঢ়ে বর্ষণোন্মুখ সন্ধ্যায় বাড়ীর সংলগ্ন গোরস্থান হ'তে আম কুড়িয়ে এনে সঙ্গিনীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছি। মনে ধারণা ছিল "কুলহু আল্লাহ্" তিনবার পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে গেলে ভূত-প্রেত কেন কিছুই সামনে আসে না। হায়রে, কোথায় গেল সেই শৈশবের অটল বিশ্বাস। আমি যে ভূতের ভয় করব সেই কথাই নয়। কিন্তু এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাত্রে নীচে গেলে আম্মা যে মারতে ছাড়বেন না, এটা খুবই জানা ছিল। তাই ভয়ে ও লোভে মনটা অভিভূত হয়ে পড়ল। এসে বিছানায় বসে পড়লুম। কিন্তু সেই অজানা সৌরভের স্নিগ্ধ অনুভূতি মন হতে সহজে গেল না। হঠাৎ এক সময় চমকে দেখি, আমি সিঁড়ি পার হয়ে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছি। জ্যোৎস্না আর সেই রকম নেই। স্নিগ্ধ দিবালোকের ন্যায় তার উজ্জ্বল কিরণ ফেটে পড়ছে। পুষ্প সৌরভ আরও মধুর ও তীব্র হয়ে উঠেছে। কোথায় গেল ভয় আর সংকোচ। অসীম সাহসে সামনের দিকে এগিয়ে গেলুম। দেখি সে পোড়ো জমির আর সেই অবস্থা নেই। অনাদৃত বধূটির মত যে এককোণে মুখ বুঁজে পড়েছিল। আজ স্বামী সোহাগিনী রূপসীর ন্যায় গর্ব্বভরে দশদিক আলো করে আছে। কি রূপ! চতুর্দ্দিকে পুষ্পকুঞ্জ বায়স্কোপের ন্যায় দৃশ্যপট বদলে গেল। সমস্ত জমিটায় কবরের মৃত্তিকাস্তুপ দেখা গেল। সেগুলি ভেদ করে জ্যোতির্ম্ময় পোষাকে সজ্জিত মনুষ্যসমূহ উত্থিত হলো। তাদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সব রকম লোকই ছিল। তারা উঠেই আমাদের "আমলনামা" দেখতে লাগলো। উজ্জ্বল আলোকে তারা সেগুলি দেখতে লাগল। দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

দেখি, জ্যোতির্ময় পুরুষদের একজন লিখছে "আমি ডাকাত ছিলুম। কিন্তু প্রত্যেক শুক্রবারে সমস্ত রাত্রি উপাসনা ও দরিদ্রগণকে সাহায্য করতুম। তাই মধ্যে মধ্যে দোজখের পুতিগন্ধ পেলেও আমি প্রত্যেক শুক্রবার রাত্রে বেহেশ্‌তে যাওয়ার এবং বেহেশতী লোকদের সঙ্গে উঠার ক্ষমতা নাই। তাছাড়া দানের ফলে আমার কবরও আলোকিত থাকে। বেহেস্তে এক হুর আমার জন্য অপেক্ষা করে। অন্য একজন লিখলেন, আমি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলুম। পাঁচটি সন্তান ও স্ত্রীর ভরণ পোষণের ক্ষমতা আমার ছিলনা। তাই বাধ্য হয়ে চুরি করতুম। কিন্তু উপাসনা আমার নিত্যকর্ম ছিল এবং চুরির জন্য অনুতাপ করতে করতেই আমার মৃত্যু হয়। আমি সন্তান-সন্ততির স্নেহময় পিতা, স্ত্রীর প্রেমময় স্বামী এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিলুম। সৎকর্মের ফলে আমি নিত্য বেহেশ্‌তে থাকি। একজন মেয়ে মানুষ লিখলেন, "আমি আমার স্বামীকে খুব ভালবাসতাম, আমাদের দুটি সন্তান ছিল। মোটের উপর আমরা দুনিয়াতেই স্বর্গসুখে সুখী ছিলুম। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি অধার্মিক, অত্যাচারী ও কুক্রিয়াসক্ত হয়ে উঠলেন। তাহার প্রহার আমি সহ্য করতুম। কিন্তু যেদিন তিনি মদ খেয়ে একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে এসে আমার চোখের উপর কোলের ছেলেটিকে আছাড় মেরে, মেরে ফেললেন, সেদিন আর সহ্য হল না। একখানা দা দিয়ে তাঁকে হত্যা করে নিজেও কলসী গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করলুম। বৌকে বলতে লাগলো, ওটা কুলটা ছিল। তাই স্বামীকে ও ছেলেটিকে মেরে অন্য লোকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। আমি এখন স্বামীকে নিয়ে খুব সুখে আছি। স্বামীকে ছেড়ে আমি বেহেশ্‌তেও যেতে চাইনি। আমি খুব ধার্মিক ও পতিপরায়ণা ছিলুম। স্বামীকে অধর্মের হাত হতে রক্ষা করার জন্যই হত্যা করি।"

এইসব লেখার পর বেহেশ্‌তী বালকগণ তাঁদের জন্য বেহেশ্‌তী খানা ও মেওয়া নিয়ে এলো। তাঁরা খেয়ে কোরআন শরীফ পড়তে লাগলেন। সম্মুখে অপূর্ব প্রভাময় আলো জ্বলতে লাগলো।

একদিকে কয়েকজন মলিন বেশপরিহিত ব্যক্তি উঠেছিলেন। তাঁদের সম্মুখে দুর্গন্ধময় খানা ও আমলনামা। তাঁরা উপাসনশীল হওয়ায় দোজখের আবহাওয়ার মধ্যেই বাস করতে হয়। তাঁদের কেউ দিবারাত্রি তস্‌বিহ্‌টি জোছেন। আর সুদ খেয়ে টাকা রোজগার করেছেন। অথচ দরিদ্র প্রতিবেশী না খেয়ে মরেছে। একমাত্র পুত্র ও স্ত্রী অর্দ্ধাহারে শুকিয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। অথচ তাঁর টাকার থলি দিন দিনই মোটা হয়েছে। কেউ বা মৌলবী ছিলেন। লম্বা লম্বা দাড়ি নেড়ে ওয়াজ-নসিহত করেছেন। অথচ ভুল ফৎওয়া দিতে বা অন্যায় কাজ করতে কখন ছাড়েননি। আমি দেখে অবাক হয়ে ভাবলুম। "ইয়া আল্লাহ, যত চোর ডাকাত আর স্বামী স্ত্রীতেই বেহেশ্‌ত পরিপূর্ণ করবে। আর তস্‌বীহ টিপনেওয়ালারা যাবে দোজখে। এইজন্যই তোমাকে লীলাময় বলে?" একটু পরেই দেখি সব মিলিয়ে গেল। তখন ফুলের তালাসে আরও এগিয়ে গেলুম। আশ্চর্যকাণ্ড, আমার একটুও ভয় করল না। খানিকটা যেতে রাস্তা-ঘাট দেখে বিস্মিত হলুম। এখানকার সব আমার চেনা। কই কোথাও তো এত ফুল বাগান, পরিষ্কার রাস্তা, আর চোখ ঝলসানো জ্যোৎস্না দেখিনি? রাস্তা পার হয়ে একটা প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়লুম। এদিকে যে গোয়ালা ও স্বর্ণকারপাড়া ছিল তারা কোথায় গেল? অথচ আমি যে বাড়ী ছেড়ে এত দূর এসে পড়েছি সে জ্ঞানও নেই। প্রান্তরের মধ্যে ছোট পুষ্প বিথী, তাতে গোলাপ, বেলী, যুঁই, হাস্নাহেনা, ও অনেক নাম না জানা সুগন্ধি ফুল ফুটে রয়েছে। সব নরনারী যুগলমূর্ত্তিতে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেকের গলায় ও কবরীতে সুগন্ধি পুষ্পহার এ ছাড়া অন্য অলংকার নেই, প্রত্যেক কুঞ্জেই অপূর্ব পুষ্পশয্যা কেউবা বাহুতে বাহু বেঁধে ফুটন্ত জ্যোৎস্নায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ বাঙ্গালী, কেউ জাপানী, কেউ আর্মেনিয়ান, কেউ তুর্কী, কেউ ইংরেজ, কেউ বা ভুবনমোহিনী ইরানী সুন্দরী। প্রণয়িগণ ও বিভিন্ন দেশীয় এমন কি যুগলের মধ্যেও দু'রকমের লোক দেখা গেল। নানা রংগের

পোষাক ও ফুল ভূষায় লোকগুলিকে প্রজাপতি বা পরী বলে বোধ হচ্ছিল। মনে হয়, আমি যেন এক স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছি। কতকদূর অগ্রসর হইতেই এক স্বচ্ছ ও নীল সলীলা দীঘির ধারে এসে পড়লুম। তাতে প্রকাণ্ড থালার ন্যায় রক্ত কোকনদ ও শ্বেত রাজহংসের ন্যায় ছোট ছোট নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন কোন প্রণয়ি যুগল নৌকায় বসে চিরপুরাতন অথচ নূতন ভাষায় অস্ফুট গুঞ্জনে আলাপ করছে। একটা অপূর্ব সুন্দরী আমার সমবয়স্কা দুগ্ধ-শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা নারী এসে আমার হাত ধরে বল্‌লে, "তুমি" দেশটা ভাল করে দেখবে ভাই ? তা'হলে আমার সঙ্গে চল। কোন স্থানে মনুষ্য সমাগম নেই ; শুধু বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে রয়েছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এদেশের নাম কি ভাই ?" মেয়ে উত্তর দিলে, কবির কল্পনা রাজ্য। বললুম "আমার কল্পনা দেখতে পাব নাকি ?" সে উত্তর করল তাহলে আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে সকলের কল্পলোকই দেখতে পাওয়া যাবে।" আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে পরে দেখলুম, সে ফুলবন আর নেই, বিচিত্র সৌধসমূহ রাজপথ আলো করে রয়েছে। অযুত মণি—সৌধ ফুটন্ত জ্যোৎস্নাকেও, পরাজিত করেছে। আমি বল্‌লুম, "রাস্তায় যদি কোন পরিচিত লোকের মানসপুরী থাকে, আমায় দেখিয়ে দিও।" কিছুদূর যেতেই সে বল্‌লে, "দেখ তোমাদের ঝিয়ের কল্পনা।" দেখলুম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম ; যে বেচারী সারাদিন যেন তেল হলুদ আর রান্নাঘরের কালীতে ভূত হয়ে থাকে, তার কল্পনা এত সুন্দর ! একখানা চমৎকার বাংলোর মত খাড়া বাড়ীতে তার স্বামীকে নিয়ে সুখে ঘর করছে। পিতল কাঁশার জিনিষগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। উঠান তরকারী ও ফুল-বাগান বেড়া বেয়ে ঝুমকা লতা উঠেছে। উঠানটিও তক্‌তকে ! তাঁর পরণে একখান বুটিদার ঢাকাই শাড়ী। গায়ে দু'চার খান গহনা, কোলে একটি মোটা সোটা নধর শিশু। সঙ্গিনীটি বল্‌লে, "ওর স্বামীর কল্পলোক দেখবে ?" আমি বললুম, "দেখাও" একটা একতলা পাকা বাড়ীতে নিয়ে গেল দেখি ওর স্বামীটি এক

চেয়ারে বসে তামাক টানছে। অসংখ্য চাকর দাসী প্রাণপণে তার হুকুম তামিল করছে, আর ঝম ঝম করে টাকা গণে গণে সিন্দুক বোঝাই করছে। কি মজা! সে পুরুষ মানুষ কিনা, তার কল্পনাও উচু দরের। আমার নিজের চাকরানির কল্পনা দেখতে গিয়ে দেখি শুধু বেনারসী শাড়ী, গহনা, আর একঘর বোঝাই পান সুপারী ও বিড়ি। মর্ হতভাগী ছুঁড়ি। তোর মুখাগ্নির আর জায়গা পেলি নে? বল্লুম আমাদের ছোকরা চাকরটার মনে কি আছে দেখব।" তাতেও দেখা গেল একদিকে চিঁড়া আর একদিকে বাতাসা নিয়ে সে খাচ্ছে আর খাচ্ছে। আর তারও রাশিকৃত তামাক-টিকে আর গোটা দশেক হুঁকো। আমার মার মানস লোক দেখি, ধন-জন পরিপূর্ণ সংসার। আর আমার মরা ছোট ভাইটি। অসংখ্য চাউল, টাকা ও কাপড়ের স্তুপ তিনি দু'হাতে বিলুচ্ছেন। একদিকে বাবা বসে আছেন; কি সুন্দর! আমার আট বছরের ভাইটির কল্পলোকে দেখলুম ঘুড়ি, লাটিম, মাছ ধরবার ছিপ ও বঁড়শী, ছুরি, নানা রংয়ের ছবির বই, লাল পেন্সিল রং ও ত্রিশটি টাকা এর বেশী বেচারার মাথায়ও আসেনা। তিন বৎসরের ছোট্ট বোনটির লজঞ্জুস, লালচুড়ি, লালফ্রক, পুতুল, কাঁচা পেয়ারা ও কমলা দেখতে পেলুম। এক একজন ধার্মিক লোকের অন্তঃকরণ দেখে ভয়ে শিউরে উঠলুম। চারিদিকে যেন নরকের কীট কিলবিল করছে। সুরা ও বিলাস ব্যাসনের স্রোত চলেছে। এরাই আবার ধার্মিক ও সমাজনেতা বলে বিখ্যাত। এইসব দেখছি, এমন সময় মেয়েটি বলে উঠল "বন্ধু, এইসব দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে যে," তোমার কল্পনা দেখবে কখন? "একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চল্লুম। কতকটা গিয়েই দেখি এক পুষ্পকুঞ্জ ও বাগানবেষ্টিত গৃহ, তাতে দু'তিনটি হৃষ্টপুষ্ট দেবশিশুর ন্যায় রক্তিম-গণ্ড শিশু। গৃহমধ্যে ভক্তিমতী উপাসনারত একনারী, সঙ্গিনী বল্লে, এই তোমার মানসপুরী" আর কতকটা এসে সে বললে, এইবার আমি বিদায় হই, তুমি বল দেখি এসব দেখে কি অভিজ্ঞতা পেলে? আমি বললুম "কবির মানসলোকে দেখা গেল শুধু একঘেয়ে সুখ

পেলেই তারা তৃপ্ত হয়। তাতে সুখ আছে দুঃখ নেই; মিলন আছে বিরহ নেই। কপোত-কপোতীর ন্যায় তারা সুখ-নীড় রচনা করে কিন্তু সুখ দুঃখ ও হাসি-কান্নার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বিচিত্র লীলাময় সংসার যাত্রা নেই, আমি এসব ভালবাসিনা। তিক্ত হোক, মিষ্ট-হোক, আমি চাই জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে। ফেনিলোচ্ছল জীবন সুরার কানায় কানায় পূর্ণ পেয়ালা গ্রহণ ক'রবই। তাতে বুকই জ্বলুক আর নেশাই হোক শুধু সুখ নিয়ে কি জীবন চলে? দেবীর ও মানসীর পূজা শুধু প্রেয়সীকে দেব? আমি বলি

"এস থাকি দুইজনে
সুখে-দুঃখে গৃহ কোণে
দেবতার তরে থাক ভক্তি-অর্ঘ্য ভরে।"

বন্ধু মৃদু হেসে উত্তর দিল, "বন্ধু! ঐ টুকুইতো কথা। মানুষে যেটা পায় না, সেটাকেই চির আকাংক্ষিত মনে করে।" তারপরে বল্‌লুম, "আমাদের মানসলোকে দেখলুম মানুষকে যত ছোটই মনে করি না কেন, তারও একটা সুখ দুঃখ ও আদর্শ আছে। প্রত্যেক ধূলি কণাটিরও সার্থক জীবন" সে চুপ করে রইল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তুমি কে ভাই?" মধুর হাসিতে তার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত ও ঝল্‌মল করে উঠল। সে বললে "বন্ধু! তুমিই আমি। আমিই তুমি। তোমার প্রিয়তমের মানসী আমি।" আমি ব্যগ্র হয়ে তার দিকে চাইলুম একি, মুখের ছাঁচ ও চোখের চাহনী অনেকটা আমারই মত যে! কিন্তু আমার তো এমন জ্যোৎস্না-বর্ণ, যুগ্ম ভ্রু; বাঁশীর মত নাক ও হাঁটু-ছোয়া চুল নেই! কি সুন্দর! সে বল্‌লে, "তোমাকে আদর্শ করেই আমি গঠিত হয়েছি। কিন্তু তার মনের মধ্যে তুমি আরও সুন্দর। সে রূপ মানুষের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা বুঝি বিধাতারও নেই।" আমি হেসে বললুম "তবে তো তুমি আমার সতীন।" সে বিদায় হয়ে গেল। পূর্বগগনে প্রভাতী তারা দপ্‌দপ্ করে জ্বলছিল। পাণ্ডুর চাঁদ আকাশের

এককোণে হেলে পড়েছে। এতক্ষণে বাড়ী ফেরার কথা মনে করে আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠলো। সহসা চুল কেটে দিতেই চেয়ে দেখি, ছোট বোনটি চুল ধরে টেনে বলছে "আপ্পা, কত "ঘুম" যায়? তেনে উতিয়ে দেব। আমাল জোল আছে। আমাল নাস্তা দেবে কে?" "পাজি" বলে ধরমড়িয়ে উঠে দেখি প্রভাতের আলোয় ঘর ভরে গেছে। *

---

* সাহিত্যিক ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৪ (১০ম সংখ্যা।)

শ্রমিক

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"বলি শুনছ, আমার জামাটা ধুয়ে দেবে?" বলিতে বলিতে সাতাশ আটাশ বৎসরের যুবক রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। গৃহমধ্যে একটি বাইশ তেইশ বৎসর বয়স্কা যুবতী রাঁধিতেছিল, সে হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, জামা ধোব কি গো? কাল মোটে ধুয়েছি। আজই আবার ধুতে হবে? তাছাড়া সবেমাত্র তরকারি চাপিয়েছি, ভাত ডাল হয়ে গেছে, এখন রেখে গেলে পুড়ে যাবে যে। আমার ট্রাঙ্কে একটা পুরানো জামা সেলাই করে রেখেছি, সেইটা পরে যাও। বৈকালে এটা ধুয়ে রাখবো।" যুবক একটু অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর নাক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "শীগ্গীর ভাত তৈরী কর সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, আজ আর ফিরতেই পারব না। কাল কতক্ষণে ফিরি তাও বলা যায় না।" স্ত্রী হাসিয়া মুখ সরাইয়া লইল, যুবক কাপড় লইয়া স্নান করিতে গেল।

ইহারা পূর্বে অবস্থাপন্ন ছিল। পূর্বের জমিদারী চাল এখন কিছুই নাই। শৈশবে মাতার মৃত্যু হওয়ায় ইহার পিতা সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। সেই সুযোগে কর্মচারিগণ দুইহাতে লুট করিয়া তাঁহাকে রিক্ত করিয়া দেয়। পিতা বহুকষ্টে পুত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াইয়া ২২ বৎসর বয়সে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন। সে আজ ৬ বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একটি পৌত্র দেখিয়া গিয়াছেন। এখন আরও দুইটা সন্তান হইয়াছে। এখন তাহের হোসেন শ্বশুরের সাহায্যে ত্রিশ টাকা বেতনে গার্ডের চাকুরী পাইয়াছেন। দরিদ্রের জন্য ইহাই যথেষ্ট। পরিবারও খুব ছোট নয়। নিজে, স্ত্রী এবং

পাঁচ, তিন বৎসর ও ছয়মাস বয়স্ক পুত্রকন্যা তিনটা, বাজার করা ও ফুট-ফরমায়েশের জন্য একটা ১৩-১৪ বৎসরের ছোক্‌রা চাকর—মোট ছয়জন। বাসা ষ্টেশন-কোয়াটারেই পাওয়া গিয়াছে। চাকরটির বেতন মাসিক দুই টাকা ও খোরাক-পোষাক দিতে হয়। তার উপরে নিজেদের খাওয়া দাওয়া ও কাপড়-চোপড় ছাড়া অসুখ-বিসুখ প্রভৃতিতো নিত্যই আছে। বড় ছেলেটি প্রায়ই অসুস্থ থাকে। মেয়ে ও ছ'মাসের শিশুটি বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন। স্ত্রী রহিমার সৌন্দর্যের বা বেশ-ভূষার কোন আড়ম্বর না থাকিলেও তাহাকে সুন্দরী বলা চলে। উপন্যাসের নায়িকাও নয়—আবার কুৎসিতাও নয়। সাধারণ ভদ্রলোকের মেয়ে যেমন হয়, সেই রকমই। স্নিগ্ধ উজ্জল শ্যামবর্ণ। ঈষৎ লম্বা-ছাঁচের মুখ। কালো বড় বড় চোখ দুটি ও সুগঠিত দীর্ঘদেহ সবটাই মানানসই। বিবাহের সময় শ্বশুর বঁধূকে কিছু দিতে না পারিলেও বালা ও ইয়ারিং এবং ছোটখাট দু'একখানা অলঙ্কার দিয়াছিলেন। বালা জোড়া তাঁহার অসুখের সময়ই বিক্রয় করিতে হইয়াছে। ইয়ারিং জোড়া সর্বদাই কানে থাকিত। হাতে কতকগুলি কাঁচের চুড়ি। এই বেশেই তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। সর্বপরি তাহার মুখে যে একটু লীলা-চপল হাসি ও আত্মসমাহিত ভাব বিরাজ করিত, সেইটুকুই মনকে মুগ্ধ ও সম্ভ্রম-নত করিত। মেয়েটা মার মতই শ্যামা ও প্রিয়দর্শনা। কিন্তু ছেলে দু'টি বাপের মত উজ্জল গৌরবর্ণ, সুশ্রী। ছেলেমেয়ে দু'টি পূর্বেই ভাত ডাল খাইয়াছিল। রহিমা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া পরিপাটি করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন বাহির করিল। দু'টি পান সাজিল। স্বামীও স্নান করিয়া আসিয়া আহারে বসিলেন। সামান্য আয়োজন—ভাত, ডাল, তেঁতুলের অম্বল, মৌরলা মাছ ও আলুর তরকারী। কিন্তু রহিমার শ্রীহস্তের স্পর্শে তাহাই অমৃতের ন্যায় হইয়াছিল। অন্ততঃ তাহার স্বামীর নিকট সে রকমই লাগিবার কথা।

দুইদিন পরের কথা। আসন্ন সন্ধ্যা। রহিমা তাড়াতাড়ি গৃহকর্ম সারিয়া ছেলেপিলেকে খাওয়াইয়া ছোট ছেলেটিকে বুকে লইয়া একখানা বই

পড়িতে লাগিল। এ অভ্যাসটুকু তার বরাবরই ছিল। মোটামুটি বাংলা ও উর্দু তার জানা ছিল। স্বামীও কোনদিন দিবসের খাটুনির পরে তাহার এই অবসরের আনন্দটুকুতে বাধা দেয় নাই। বরং প্রায়ই সে সংসার খরচ হইতে কায়ক্লেশে দুই চারি টাকা বাঁচাইয়া দু'একখানা বই ও মাসিক পত্রিকা কিনিয়া দিত। তাই রহিমার সাহিত্যচর্চ্চা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। বরং গোপনে সে কিছু কিছু লিখিত—কিন্তু সে সব লোক-লোচনের অন্তরালেই থাকিত। সে পড়িতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কান ছিল পথের পানে। সহসা কে ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল—"রমু"! রহিমা ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সহসা স্বামীর বিবর্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই সে সভয়ে পিছাইয়া আসিল। সেই সুদর্শন যুবক দুইদিনে কি হইয়া গিয়াছে। যেন খুনী আসামী—বয়সও দ্বিগুণ বোধ হইতেছে। তাহার বিহ্বল ভাব দেখিয়া তাহের অগ্রসর হইয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—"ঘরে চল রমু"। ঘরে গিয়া রহিমা নীরবে পাখা করিতে লাগিল। দু'জনেই নীরব। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহের হাত-পা ধুইয়া আসিয়া বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"পথে দাঁড়াতে হ'ল রহিমা। যে রকম রেলওয়ে ষ্ট্রাইক চলেছে, তাতে বুঝি চাকুরী আর থাকে না। পাঁচটা প্রাণীর চলে কেমন করে? একপ্রাণ কুকুরেরও চলে বটে, কিন্তু পাঁচজনকে খাওয়ায় কে? যে রকম অবস্থা—তাতে পথে চলাই দায়। কংগ্রেসী ভলান্টিয়ার ও নেতারা পথে-ঘাটে অপমান আরম্ভ করেছে। বলতো কি করি? আরও বলে যে চাকুরী ছাড়লে কোন দেশী কোম্পানীতে তোমার এক বৎসরের মধ্যে ষাট টাকা বেতনের কাজ দেব। সে সব খুব জানি। এরকম যে ওরা আরও কতজনকে মজিয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুরা দিব্বি চাকুরী করছে। যত দোষ আমাদের বেলা। কথায় কথায় স্বদেশী আন্দোলনের উদাহরণ দেয়! আমরা নাকি দেশের জন্য কিছুই করি না। বড় ছেলেটির অসুখ। সে দিন নীলমণি ডাক্তার অষুধের দামের জন্য ধরেছিল। তোমার হাতে কত আছে?" রহিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"ত্রিশটি

টাকার আর কত থাকবে ? ছেলের তো নিত্যই অসুখ। তা' ছাড়া মুদির দোকানে আর ছোট খোকার দুধওয়ালীরও মোট ৮৷১০ টাকা পাওনা হয়েছে। কুড়িটা টাকা কষ্টে সৃষ্টে জমিয়েছি।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহের বলিল—"গত বৎসর ছোট খোকার আমাশা ও আমার নিউমোনিয়া জ্বরের সময় দেশের বাড়ীখানাও পাঁচশত টাকায় বিক্রী করেছি। তার মধ্যে দু'তিন শত টাকাতো চিকিৎসা খরচেই গেল। বাকি যা' ছিল, চারমাস বিনা-বেতনে ছুটি নেওয়াতে তাও ফুরিয়েছে। চার বৎসর চাকুরী করে এইতো অবস্থা। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নেই।" সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রী কাহারও খাওয়া হইল না।

পরদিন প্রভাতে তাহের উঠিতেই একজন ভলান্টিয়ার আসিয়া তাহাকে কংগ্রেস অফিসে লইয়া গেল। সেখানে বাবু বিশ্ববিজয় মিত্র, মৌলবী আবু নাসের সাহেব প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা কর্মিগণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই মিত্রমহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"এই যে! তুমি এসে পড়েছ দেখছি। তোমার কথাই হচ্ছিল ভায়া। তা দেখ, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তোমাকেত আর বোঝাতে হবে না। বার বার বলছি, তোমার কানেই যায় না। তোমায় ১৫ দিন সময় দিলুম। এর মধ্যে যদি চাকুরী না ছাড়—তবে তোমার ধোপা, নাপিত, এমন কি বাজার-হাটও বন্ধ করা হবে।" তাহের শুষ্ক মুখে বলিল—"যদি বলেন তো, আমি কংগ্রেসের ফণ্ডে দু'এক টাকা মাসিক চাঁদাও কষ্টে-সৃষ্টে দিতে পারি। চাকুরী ছাড়লে পাঁচটি প্রাণী খাবে কি?" মিত্রমহাশয় রঙ্গভরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"দেশ চায় প্রাণ, দেশ টাকা চায় না। তবে টাকায় কাজের আংশিক সাহায্য হয় বটে।" তাহের সাহস করিয়া কহিল—"আমার প্রাণ দিলে যদি দেশের উপকার হয়, তাও দিতে পারি। কিন্তু পাঁচটি প্রাণ নিয়ে কি হ'বে ? আচ্ছা, নরেশ মিত্রকে চাকুরী ছাড়তে বলেন না কেন ?" মিত্র মহাশয়ের মুখ নিস্প্রভ হইয়া পড়িল। কারণ নরেশ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। তবু দম্ভভরে সপ্রতিভ-

ভাবে বলিলেন—"যাও হে ফাজিল ছোকরা, তার কথা তার সঙ্গে হ'বে। তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে। পথে দেখিল—একদল স্বেচ্ছাসেবক পতাকাহস্তে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া একজন চাপাস্বরে বলিয়া উঠিল—"বিশ্বাসঘাতক! স্বদেশদ্রোহী!" অপমানে তাহেরের কর্ণমূল ও সুগৌর গণ্ড রক্তিম হইয়া উঠিল। সে বাসায় ফিরিয়াই পদত্যাগ-পত্র লিখিয়া ফেলিল। ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন—"দেখহে, কাজটা বুঝে-শুনে করলে না। ওদের তালেই নেচে উঠলে। যে রকম অসময়ে আমাদের ঠেকিয়ে গেলে, এরপর তোমার গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস পাওয়া কঠিন হবে" তাহের কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রহিমা মলিনমুখে বলিল—"বড় খোকার বড্ড জ্বর এসেছে। বিকালে ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লে হ'তো। ওরজন্য একশিশি কুইনাইন, দু'টি বেদানা আর বার্লীও আনতে হ'বে।" তাহের ভাঙ্গাগলায় বলিল—"চাকরী তো ছেড়ে দিয়ে এলুম।" রহিমা শূন্যনয়নে একদিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন এক পেয়াদা আসিয়া নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিয়া গেল "পনের দিনের মধ্যে এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবে।" বড় ছেলেটির অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। রহিমার হাতে যে টাকা কুড়িটি ছিল, তাহা মুদীর ও ডাক্তারের দেনা শুধিতেই খরচ হইয়া গেল। এখন এতগুলি লোকের খাওয়া ও চিকিৎসা-খরচ জুটে কোথা হইতে? রহিমার যে ইয়ারিং জোড়া ও দুগাছি ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁধান শাঁখা ছিল, তাহা ও মেয়েটির পায়ের রূপার মল দু'গাছা বিক্রয় করিতে হইল। বিক্রয় করিলে জিনিষের মূল্য হয় না। পুরাতন জিনিষে আর কতই বা পাওয়া যায়? মাত্র ষোলটা টাকা পাওয়া গেল। অনবরত চিকিৎসা ও খাওয়ায় সবই খরচ হইয়া গেল।

আজ পনের দিনের রাত্রি। ছেলেটির অবস্থা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রহিমা পনের দিন যাবৎ একবেলা আহার স্বামী-পুত্রকে খাওয়াইয়াছে। দুইদিন শুধু ফেন জুটিয়াছে। আজ তাহাও

জুটে নাই। এক মুঠা চাউল ছিল, তাহাই ভাজিয়া মেয়েটিকে দুইবেলা খাওয়াইয়াছে। আজ তাহেরও উপবাসী। মৃতপ্রায় ছেলেটির মাত্র একবেলা বার্লি জুটিয়াছে। রহিমার পিতার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ভ্রাতার নিকট পত্র লেখায় তিনি উত্তর দিয়াছেন—"আমাদের অবস্থা তো আপনি জানেন। এ বৎসর অজন্মা হওয়ায় স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইতে না পারায় শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এ অবস্থায় শ্রীমতীকে আনা আমি ভাল মনে করি না।"

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। উপবাসক্লিষ্টা রহিমা পুত্রের পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছোট শিশুটা মায়ের বুক চুষিয়া কিছুই না পাইয়া আঙ্গুল চুষিতেছে। তিনদিন তাহার দুধ আসে নাই। তাহার কোঁক্ড়া চুল ও ফুলোফুলো গোলাপীগণ্ডে বাতির আলো পড়িয়া দেব-শিশুর ন্যায় দেখাইতেছে।

তাহের বসিয়া একদৃষ্টে নক্ষত্রখচিত অসীম অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়াছিল। কৃষ্ণ-পক্ষ রজনী। তাতে নীল আকাশে তারাগুলির কি শোভা! সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—আচ্ছা মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? বহুদিন পরে তাহার হারানো মাকে মনে পড়িল। দুঃখ দৈন্যের মাঝে মাতৃস্নেহ রিক্ত ব্যথিত মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে চাঁদ পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশে শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সহসা রুগ্ন ছেলেটি ডাকিল "বাবা, পানি।" তাহের উঠিয়া একটু পানি তাহার মুখে দিল। ক্ষুদ্র শিশু অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"বাবা, সেই সুন্দর গানটা গাও না। সেই—যাতে হজরতের নাম আছে!" তাহের অতি মৃদুকরুণকণ্ঠে "আয় হবিব পেয়ারে খোদা আঁখকি রওশন, দেল-আরাম" গজলটি গাহিতে লাগিল। তাহেরের গম্ভীর-করুণ কণ্ঠ ও নিশার নীরব ভাষা, গাম্ভীর্যে ও কারুণ্যে এক হইয়া গেল। গাওয়া শেষ হইলে দেখিল—রসুলের পবিত্র নাম শুনিতে শুনিতে শিশুর কোমল প্রাণ বাহির

হইয়া গিয়াছে। তাহার চোখের পানি শুকাইয়া গেল। একখানা শুভ্র বস্ত্রে মৃতদেহ ঢাকা দিয়া সে আবার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল—কাহারও শান্তিভঙ্গ করিল না। কাল যে সে কি খাইবে, কোথায় থাকিবে—তাহারও ঠিক নাই, এতবড় বিশাল সংসারে তাহাদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নাই। অর্দ্ধাহার-পীড়িত ছেলেটি বিশ্বপিতার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিল। প্রফুল্ল কমলের ন্যায় ছোট শিশুটি কাল হইতে অনাহারে শুকাইয়া মরিবে, মেয়েটি মার নিকট ভাত না পাইয়া তাহার নিকট চাহিবে—সে কি উত্তর দিবে? যদি বাপের ভিটা আঁকড়িয়া চাষবাস করিয়া শরীর খাটাইত, তাহা হইলে এত দুরবস্থা হইত না; বরং ক্ষেতের ধান-তরকারীতেই বেশ চলিত। শরাফৎ ও চাকুরীর মোহই তাহাকে মাটি করিয়াছে। নিজে কৃষি করিতে লজ্জাবোধ না করিলে অন্নাভাব নিশ্চয়ই ঘটিত না।

পার্শ্ববর্তী এক জমিদার-গৃহে পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ বাইজি আসিয়াছে। তিন রাত্র নাচ-গানের মূল্য দশ হাজার টাকা। সেইদিকে চাহিয়া তাহেরের দীপ্ত আয়তচক্ষু দুইটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—“আমার ঘরে খাবার নেই, ছেলেটা না “খেতে পেয়ে মরে গেল—আর এ ব্যক্তি বিনা-আয়াসে শুধু আমোদের জন্য এত টাকা ব্যয় করছে! খোদা এই কি তোমার বিচার? বুঝলুম তুমিও মানুষেরই ন্যায় অকরুণ—বিচার-শূন্য ও খেয়ালী। বুঝিবা দয়ামায়া কিছুই নাই, মানুষের মাথার উপর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষণ করিতেই বুঝি তুমি আছ।” পরক্ষণেই ভূমিতে লুটাইয়া কাতরস্বরে কহিল—“আছ বই কি প্রভু? মাতার স্নেহে, পিতার মমতায়, পুত্র-কন্যার আদরে, প্রতিবেশীর সৌজন্যে-সহানুভূতিতে, জলের শীতলতায়, জীবনের সার্থকতায়-সর্ব্বত্র যে তুমি বিরাজমান। তোমাকে অস্বীকার করি কোন্ সাহসে?” পরদিন প্রভাতের অরুণ কিরণে ধরা আলোকিত হইল। বেলা ৮টার মধ্যেই শিশুটির দাফন-কাফন সমাধা হইল। পুত্রকে সমাহিত করিয়া তাহের কোটরগত

চক্ষু ও উস্কো-খুস্কোচুলে গৃহে ফিরিল। চক্ষু শুষ্ক-দেহ উপবাস-খিন্ন, রহিমার চক্ষে পানি নাই। সেও ধরাশয্যায় মূর্চ্ছিতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। শিশু-পুত্রটিও অতি ক্ষুধায় মূর্চ্ছিতপ্রায়। এমন সময় সরকারের পেয়াদা আসিয়া বলিল—"সাহেব! আপনি দোস্‌রা জায়গায় যান, নূতন বাবু এসেছে।" টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সামান্য কাপড়-চোপড় ও তৈজস-পত্র পূর্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। রহিমার শেষ সম্বল নাকফুল ও কানফুল দুইটি বিক্রয় করিয়া সেই বৃষ্টির মধ্যেই তাহারা রহিমার পিতৃগৃহাভিমুখে চলিল। সেই নিরন্ন ও দারিদ্র্যপূর্ণ গৃহে কিভাবে দিন কাটিবে, কে জানে?

সন্ধ্যায় তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌছিল, দেখিল ঘরের চালে খর নাই, বৃষ্টির পানি ঘর ভিজাইতেছে। রহিমার ভ্রাতা সেইদিনই সকালে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছেন. একটা ছোকরা চাকর প্রহরী স্বরূপ রহিয়াছে। সেও নিকটবর্তী তাহার গৃহ হইতেই খাইয়া আসে।…রহিমা ক্লান্ত ভাবে বসিয়া। ছোকরাটি নিজগৃহ হইতে এক বাসন ভাত আনিয়া মেয়েটিকে খাওয়াইল।

সন্ধ্যায় স্থানীয় এক নেতার গৃহে কর্মীবৃন্দ সমাগত হইয়াছেন। একজন চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া বলিলেন—"আরে, সেই তাহের চাচা যে ভেগেছে জান?" আর একজন সজোরে টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিলেন—"তাই নাকি? তা বেটাকে বহুকষ্টে বাগে আন্‌তে হয়েছে।" একজন নূতন কর্মী বলিল "আজ সকালে ওর বড় ছেলেটি মারা গেছে, বেচারা চারিটি প্রাণীর আহার যে কোথা হ'তে যোগাবে আল্লাই জানেন, কংগ্রেস-ফণ্ড হ'তে কিছু দিলে হ'ত না?" মিত্রমহাশয় তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিলেন—"রেখে দাও তোমার চালাকি। দেশে দিব্যি জমিদারী রয়েছে। ওবেটার সাদা আদমীদের পা চাটতে ভাল লাগে। টাকা দেব কোথা হ'তে? এতলোক চাকুরী ছেড়েছে যে দু'টাকা করে দিলেও কংগ্রেস ফণ্ডে কুলোবেনা।"

কাপের পর কাপ চা অথবা তথাকথিত কুলির রক্ত ও সিগারেট উড়িতে লাগিল। *

---

* সওগাত ৫ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৪

"এপ্রেল ফুল"

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"গাড়ী যে এসে গেল বেগম সাব, আপনার সাজা কি হয় না? ওরূপে
সাজতে হয়না। এমনিই দুনিয়া আলো করে।" "দূর হে মুখপোড়া
বাঁদরি! "বলিয়া সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী তাহেরা আয়নার সম্মুখ হইতে
সরিয়া আসিল। পরণে একখানা ফিকা নীল রংএর সাচ্চা কাজ করা
রেশমী শাড়ী ও সেই রকমই ব্লাউজ, জ্যোৎস্নানিন্দিত বর্ণে সেই সজ্জা
দেখিয়া বোধ হইতেছিল নক্ষত্রমালাখচিত নীল আকাশ যেন তার রূপ-
মোহে মুগ্ধ হইয়া ধরণীতে নামিয়া আসিয়াছে। শাড়ীখানা নব্য ধরনে
পরা। সাজ-সজ্জার কোন বাহুল্য নাই। হাতে মিহি দুইগাছা জড়োয়া
ব্রেসলেট। গলায় বড় বড় মুক্তার একছড়া মালা ও কানে দুইটি হীরার দুল।
কাধের উপর মুক্তার ব্রোচ, এ ছাড়া অন্য অলঙ্কার ছিলনা। চুলগুলি
সাদাসিদাভাবে প্লেন করিয়া আঁচড়ানো। ঝি ও ছোট দেবরটিকে ডাকিয়া
সে বেড়াইতে চলিয়া গেল। নীচে বৃদ্ধা শাশুড়ী বক্ বক্ করিয়া
বকিতে লাগিলেন; "বান্নু তুই হলি ঘরের বৌ, তোর ধিঙ্গি হয়ে বেড়ানো।
মোট এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে। আমাদের দেশের বউয়েরা পাঁচ ছেলের
মা হয়েও ঘোমটা ফেলে কথা কয় না। আবার বেড়াতে যাওয়া। আর তো
দিনরাত স্বামীর সঙ্গে মুখো-মুখী হয়ে গল্প আর ইনজিরি কেতাব পড়া;
তুই কি উকিল ব্যালেষ্টর হবি? তা ঘর কান্নার কাজকর্ম্ম রাঁধা বাড়া বউ
ভালই করে। করলে কি হয়? ফোরসৎ পেলেই ওই কেতাব পড়া আর
বেড়ানো। বউ মানুষ, কাজ-কর্ম্মে অবসর হয়ে গল্প-সল্প করবি। তাস-দাবা
দশ-পঁচিশ খেলবি। না হয় দু-দণ্ড ঘুমুলি। তোদের এখন ওই করবার

সময়। তা না যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড। বেড়াতে যাবি বিয়ের বেনারসী শাড়ীখানা পরে, হাতে দশ ভরির ব্রেসলেট, পায়ে পনের ভরির মল, চুড়ি, হার, নেকলেস, সাত নহরী চিক্‌খানা, আংটি, বাজু, জশম, তাবিজ, ইয়ারিং সব পরবে, চুলগুলি ভুরু অবধি নামিয়ে সিঁথি পরে জাদের খুপি দিয়ে, পেরজাপতি খোঁপা বেঁধে, জরির জুতা পায়ে দিয়ে যাবে, তবে তো লোকে বলবে যা হোক বউ বটে!" আল্লার নামে বড়াই করে বলতে পারি, এখনো এমন সাজানো সাজিয়ে দেব যে দশ গাঁয়ের লোকে দেখে চেয়ে থাকবে, দাঁতে একটু মিশি নেই, চোখে কাজল নেই, হাতে মেহেদি নেই। একে কি লোকে বউ বলে? গট্‌ গট্‌ করে বেরিয়ে গেল যেন এক খৃষ্টেন মাগী! অবাক করলে মা—অবাক করলে কাকেই বা কি দোষ দেব, ছেলের পছন্দও তেমনি। নইলে আমার ভাশুর ঝি হামিদা ছিল চৌদ্দ বছরের মেয়ে। ঐ টুকু মেয়ের কি গুণ একশত লোককে রেধে বেড়ে খাওয়াতে পারে। তাছাড়া ইনজিরি পড়তে আর জামা সেলাই করতে না জানলেও কাঁথা সেলাই করতে আর উকুন বাছতে তার জুড়ি নেই। সুর করে যখন রোস্তম-সোহরাবের পুঁথি পড়ে তখন চোখে পানি এসে যায়। সে মেয়ের কাছে এ বৌ! হুঁ। সহসা রাধুনীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিল। তিনি তসবিহ হাতে করিয়াই রান্না ঘরের দিকে চলিলেন।

তাহেরা কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাহার পিতার কলিকাতায় দু'তিনখানা বাড়ী ছিল। নিজেও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যারিষ্টার। সুতরাং মাসে প্রায় ৪-৫ হাজার টাকা আয় হইত। প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী। লাইট, ফ্যান, মোটর, দাসদাসী, বিলাসিতার আবশ্যকীয় সরঞ্জাম সব ছিল। ছিল না শুধু গৃহের শোভা, নয়নের আলো পুত্র-কন্যা। অবশেষে বহু আরাধনার পর মধ্যবয়সে এই তাহেরা জন্মগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, নিঃসন্তান পিতা-মাতার নিকট ইহাই শত-পত্র তুল্য। তাহেরা বহু যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিল। বেথুন স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত পড়িয়াছিল।

পিতামাতার ইচ্ছা ছিল কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দিবেন। কিন্তু পরীক্ষার দুইমাস পূর্বে হঠাৎ বিবাহ হইয়া যাওয়ায় সে আশা ফলবতী হইল না। জামাতা লুৎফল হোসেন অর্থবানের ছেলে হইলেও অসাধারণ প্রতিভা, উন্নত চরিত্র, মধুর প্রকৃতি, সৎ বংশ ও প্রভাময় রূপ দেখিয়া পিতামাতা তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশাও ফলবতী হইয়াছিল। বিবাহের দুইমাস পরেই লুৎফল হোসেন এলাহাবাদে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়। তাহার স্নেহ-ভালবাসায় তাহেরাও খুব সুখী হইয়াছিল।

বিবাহের পূর্বে স্থানীয় অন্য একজন ব্যারিষ্টার আতাহার আলী সাহেবের কন্যা তাহার সমান রূপ-গুণসম্পন্না সহপাঠিকা ও সমবয়স্কা একটি মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। বাসা কাছাকাছি হওয়ায় দুইজনে খুব চিঠিপত্র লেখালেখিও চলিত। বিবাহের পর সুদীর্ঘ কাল দেখা হয় নাই। সম্প্রতি তাহারও বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী এলাহাবাদেই উকিল হইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ তাহেরা সখী সন্দর্শনে গিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল—আরও দুই চারিজন ভদ্রমহিলা নিমন্ত্রিতা হইয়াছেন। সকলেই সুন্দরী ও সুসজ্জিতা। কিন্তু তাহেরার সমকক্ষ একজনও ছিল না। তাহাকে দেখিয়া একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল। সখী ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সকলেই বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"লতিফা, এখন কেমন আছ ভাই?" আর একজন উত্তর দিলেন,—"কেমন আর থাকবে? আগে যা এখনও তাই। বেচারী না পেলে স্বামীর ভালবাসা, না পেল জীবনে সুখ-শান্তি। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে মা-বাপ ওর ভবিষ্যতটাই মাটি করে দিয়েছে।" মুনসেফ্ গৃহিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"যা বল ভাই বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখেছে। পুরুষ মানুষগুলি হাড়ি কলসী বই কিছুই নয়। দুদিন না দেখলেই নোংরা হয়ে যায়। সর্বদা মাজ, ঘষ, পরিষ্কার কর, তবেই ঝক্‌ঝকে থাকবে।" বলিয়া সকলের মুখের পানে চাহিলেন। সাব-

গৃহিনী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ অবনত করিলেন। কারণ তাহার স্বামী ভয়ানক বিলাস ব্যসন ও পানাসক্ত। প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তবুও চরিত্র সংশোধিত হইল না। সে মজলিসে সাবজজ গৃহিনীর ন্যায় রত্নালঙ্কার কারও ছিল না। কিন্তু রত্নালঙ্কারে যদি সুখ হইত তবে রাজা বাদশার ঘরে রাণী ও বেগমগণ মনিমুক্তা খচিত পর্য্যাঙ্কে শুইয়া মুক্তার ঝালর দেওয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত না। একজন তাহেরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আপনি এমন মুখ বুঁজে বসে আছেন কেন? গল্প সল্প করুন না?" তাহেরার সখী বলিয়া উঠিল "কথা বলবে কি, স্বামীর সোহাগেই ও ভরপুর। আমাদের কথা কি ওর মনে স্থান পায়?" তাহেরার গণ্ড দুটি শরমে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বাস্তবিকই স্বামীর ভালবাসায় তাহার হৃদয়খানি পরিপূর্ণ ছিল।

চারিটার পূর্বেই মেহমানগণ চলিয়া গেলেন। কারণ সকলেরই স্বামী অফিস হইতে ফিরিবেন। কিন্তু তাহেরার যাওয়া হইল না। বহুদিন পরে সখীর সাক্ষাৎ। এত শীঘ্র কি বিচ্ছেদ হইতে পারে? বহুক্ষণ ভাব ও কথার বিনিময়ের পর সখী তাহেরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা তাহেরা, তোর স্বামী তো এত বুদ্ধির বড়াই করেন ওঁকে কোনমতে ঠকালে হয় না?" তাহেরা হাসিয়া বলিল—"তুমি জব্দ কর না ভাই, আমি কি মানা করি?" তখনই দুই সখীতে বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহেরা বিদায় গ্রহণ করিল। বাসায় আসিয়া দেখিল স্বামী উদগ্রীব হইয়া পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অন্যদিন এ সময় তিনি ক্লাবে চলিয়া যান। আজ এখনও তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আসিতেই বলিলেন "সইকে পেয়ে একেবারে বাড়ীঘর সব ভুলে যাওয়া হয়েছে। আমাদের কথাতো মনে থাকবার কথাই নয়।" বলিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ক্লাবে চলিয়া গেলেন।

তাহেরা তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। ফুফু সাহেবা তসবিহ হাতে করিয়া একখানা জলচৌকির উপর বসিয়াছিলেন। রাঁধুনী মোরগ কুটিয়া ধুইতেছিল। তাহেরা ঢুকিয়াই চুলার উপর ডেকচি দিয়া মশলা কষিতে লাগিল। ফুফু সাহেবা ঝনঝনে গলায় বলিয়া উঠিলেন,— বাপু আমরাও এককালে বউ ছিলাম। এমন কাণ্ড কখনও দেখিনি। এই সাদাপানা কাপড় আর দু'খানা গয়না পরে লোকের বাড়ী ধেই ধেই করে যাওয়া আর রাতের অর্দ্ধেক কাটিয়ে আসা। বাছা আমার, দিন থাকতে এসে মুখ চুন করে বসে রয়েছে। এত কেন বাপু? তুমি আমার হলে তো আমি তোমার?" বলিয়া উঠিয়া নিজ শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। রাঁধুনী দ্বারের প্রতি চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—"তুমি গেছ পর্যন্ত উনি ওই কথা নিয়েই আছেন মা, আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। নেহাৎ কানে তুলো দিইনি বলে শুনতে হয়েছে।" তাহেরা কিছুই বলিল না। নতমুখে গোশ্‌তগুলি দেগচিতে ঢাকিয়া দিল। এক বৎসর যাবতই সে এই রুক্ষ প্রকৃতি কর্কশভাষিণী ফুফু শাশুড়ীকে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর কানে এসব দিলে তিনি তৎক্ষণাৎই তাঁহার অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন কিন্তু বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও সে অত্যন্ত চাপা ও সহিষ্ণু প্রকৃতির মেয়ে ছিল। বিশেষতঃ প্রেমে যাহার বুক ভরা, এসব তুচ্ছ বিষয় সে গ্রাহ্যও করে না। তাহেরার পিতা তাহাকে নারীর উপযোগী সমুদয় শিক্ষাই দিয়াছিলেন। সে বায়রন মিল্টন হইতে সাদী ও হাফেজের কাব্যসুধা সমস্তই আস্বাদন করিতে পারিত। স্কুলের পড়া ছাড়াও পিতার নিকট তাহাকে অতিরিক্ত পড়িতে হইত। তদ্ব্যতীত গৃহকর্ম ও সেলাই রান্না হইতে ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্যন্ত সব কার্যেই সে সুনিপুণা ছিল।

চার পাঁচদিন পরের কথা। লুৎফল হোসেন সাহেব আফিসে যাওয়ার সময় তাহেরা আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আজ একটু সইদের ওখানে যেতে হবে; সে অনেক করে বলেছে, না গেলে রাগ করবে।" তিনি কহিলেন, "বেশতো,

যেতে পার। একেবারে সব ভুলে থেকো না যেন।" সেদিন ডেপুটি সাহেব তিনটার সময়ই ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ থাকায় সকাল সকাল ফিরিয়াছেন। আসিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সোফায় পড়িয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। একটু পরে টেবিলের ড্রয়ারটি খুলিলেন। তাহাতে তাহেরার প্রসাধনের চিরুণী, রেশমী ফিতা, স্নো ও কাঁটা ছিল। সেগুলির মধ্য হইতে একটা স্নিগ্ধ মৃদু সৌরভ বায়ু হিল্লোলে ভাসিয়া আসিল। লুৎফল হোসেন চিরুণীখানা লইয়া ওষ্ঠে ছোঁয়াইল। তৎপর আর একটা ড্রয়ার খুলিতেই তাহার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহেরার একটি ক্ষুদ্র হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বাক্স ছিল। সেটি সে স্বামীর সম্মুখে কখনও খুলিত না। এই বাক্স লইয়া বহু বিবাদ বিসম্বাদ ঝগড়া ও মান অভিমান হইয়া গিয়াছে। তবুও তাহেরা দেখিতে দেয় নাই! চাবিটি একটি ক্ষুদ্র আংটির ন্যায় রিংএ সংবদ্ধ হইয়া তাহেরার চুড়ির সঙ্গেই থাকিত। আজ সেই অমূল্য চাবিটি ড্রয়ারের ভিতরে রহিয়াছে। লুৎফল হোসেনের দুইচক্ষু ব্যগ্র আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে চাবিটি ও বাক্স লইয়া সোফার উপর বসিয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিল। দেখিলেন ফিকা নীল রংয়ের বড় বড় চৌকা প্রায় একশতখানা খাম গোলাপী ফিতায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একখানা খুলিয়া বাহির করিতেই দামী এসেন্সের তীব্র গন্ধে ঘর আমোদিত হইল। প্রেমপত্র যে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। প্রত্যেক লেফাফার উপরই তারিখ অনুসারে নম্বর দেওয়া আছে। প্রথম পত্রখানা খুলিয়া দেখিল তাহাতে লেখা আছে—

কলিকাতা
১৬ই জানুয়ারী

মানসী আমার!

উষর এ মরুভূতে কোথা হতে এলে তুমি?
হেথা গান নেই, প্রাণ নেই, আলো নেই। কি নিয়ে তুমি তৃপ্ত হবে?

তোমায় দেখে মনে হয় তুমি আমায় ভালবাস। যদি তাই হয়, তবে হে প্রিয়া! আমার সর্ব্বস্ব ঢেলে দিলুম, তুমি গ্রহণ কর।

তোমার পত্রের আশায় তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় উদগ্রীব হয়ে রইলুম।

তোমারই
"মজিদ"

অন্য একখানায় লেখা ছিল—

প্রিয়তমা!

কাল তোমায় পেয়েছি। কি পরিপূর্ণ সে পাওয়া! তোমায় বুকে টেনে নিয়ে চুলগুলি খুলে দিলুম। গোলাপী গণ্ডদুটিতে চুম্বন এঁকে দিলুম। হাতে পবিত্র প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিলুম। তুমি আপত্তি করলে না। তাতে বুঝলুম তুমি আমারই। আজ মন আমার খুশীতে ভরপুর।

তোমার প্রণয় কাঙ্গাল
"মজিদ"

আর একটায় লেখা

রাণী আমার!

আজ তুমি আমায় ছেড়ে অন্যের হয়ে যাচ্ছ। জানি তুমি আমার হয়ে থাকতে পার না। সে দুরাশা। ওগো প্রিয়া, নিতান্তই দুরাশা। আকাশের চাঁদ কখনও ধরার ধূলায় ফোটা পদ্মের কাছে নেমে আসে না। আসতে পারে না। আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব দুঃখ আমায় দিয়ে তুমি সুখী হও।

তোমার সুখ বঞ্চিত
"মজিদ"

সবগুলি পত্রই বিবাহের পূর্ব্বের লেখা। প্রত্যেক পত্রই এইরূপ আবেগময়ী ভাষায় লেখা। পড়িয়া লুৎফল হোসেনের মাথার ভিতর অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বজ্রাহতের ন্যায় দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। উঃ! কি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা! এই কলঙ্কিনী দুশ্চারিণী ও

অজানা নারীকেই সে প্রাণ দিয়া ভালবাসে! একবার মনে করিল যদি অন্যের পত্র তাহেরাকে রাখিতে দিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক পত্রের উপর বড় বড় অক্ষরে তাহেরার নাম লেখা। দৃপ্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল "হয় তোমার কলঙ্কিত জীবনের অবসান হবে, না হয় আমি আত্মহত্যা করব।" পরক্ষণেই তাহেরার সারল্যমণ্ডিত আনন ও ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া তাহার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। যে চক্ষু হইতে একটু পূর্বে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে সাগরে পরিণত হইল। ইতিমধ্যে কখন যে বহির্দ্বারে একখানা গাড়ী আসিয়াছে ও দুইটি যুবতী আসিয়া দ্বারের ছিদ্র পথে সমস্তই দেখিতেছে তাহা সে লক্ষ্যও করে নাই। হঠাৎ একটি দাসী আসিয়া তাহার হাতে ঠিক সেই রঙের একখানা খাম দিল। বিস্ময়ে অবাক হইয়া লুৎফল হোসেন ক্ষিপ্রহস্তে পত্র বাহির করিল। তাহাতে পরিষ্কার ও ঠিক চিঠিরই লিখিত অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা

"এপ্রেল ফুল"

মজিদা খাতুন ওরফে

"মজিদ"

পর মুহূর্তে হাসিমুখে তাহেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি গো! কান্নাকাটি শেষ হোল! সইএর চিঠিগুলি চুরি করে পড়া হচ্ছে যে।" দ্বারান্তরাল হইতে মজিদার শাড়ীর আঁচল দেখা যাইতেছিল। সে ব্যঙ্গভরা সুরে কহিল, "এত শিগ্‌গীরই শেষ হবে? পদ্মায় জোয়ার এসে গেছে যে!" লুৎফল হোসেন পূর্ববঙ্গবাসী, তাই এ পরিহাস। পঞ্জিকাখানাও পহেলা এপ্রিলের ছাপ লইয়া মূর্তিমান বিদ্রূপ রূপেই দেয়ালে বিরাজমান!*

---

* মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৫ সাল। পৃঃ ৪০১-৪০৪

ঈদের চাঁদ

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"আম্মা একটু পানি"—

"বেশী পানিও তো নেই বাবা, সন্ধ্যা না হলে পানি আনাও যাবেনা, যে লোকের ভিড়"

"ভিড় কেন আম্মা ?"

"আজ যেরে ঈদ"

"ও—মোটেই মনে ছিল না, বাবা একবার ঈদের সময় আমাকে সিল্কের আচকান আর জরির টুপী কিনে দিয়েছিলেন সেগুলি কি হল মা ?

"তোমার ছোট হয়ে যাওয়ায় বিলিয়ে দিয়েছি।"

মাতা পুত্রে কথা হইতেছিল, বাহিরে তখন আকাশে সূর্য সোনার কিরণে সন্ধ্যার নীলাম্ববীর পাড় বুনিতেছিল।

"কি খেলেন আজ ?"

'যা ছিল তাই খেয়েছি তোর অত কথার কি দরকার ?

"তা আম্মা সত্যি কথাটা বলুন"

"দু'টো মুড়ি ছিল তাই খেয়েছি।"

"কেন চাল নেই ?"

মা কথা কহিলেন না। দুর দিগন্তের পানে চাহিয়া চোখ দু'টি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। বেশী দিনের কথা তো নয়, মাত্র পাঁচটি বছর আগে এই দিনে তিনিও যে কত রকম রাঁধিয়া দশজনকে খাওয়াইয়াছেন আর আজ ঘরে একমুঠা চাউল নাই, রুগ্ন পুত্রটির পথ্য নাই। সম্মুখে ওই জমিদার বাড়ী। তিনিও তো একদিন বধূ বেশে সেই বাড়ীতেই আসিয়াছিলেন। বর্তমান

জমিদার তখন বালক মাত্র, এক মাথা কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, হৃষ্টপুষ্ট বার চৌদ্দ বছরের ছেলেটি আসিয়া সন্দেহ-মিশ্রিত ভয়ের সহিত লাল বেনারসী জড়ানো পুঁটুলির পানে চাহিয়া ডাকিয়াছিল, "ভাবি"। সদ্য ভ্রাতৃহারা ষোল বছরের মেয়েটি সে মুখে বুঝি মৃত ভ্রাতার সাদৃশ্য পাইয়াছিল, ঘোম্‌টা একটু ফাঁক করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিল, ঠিক তেমনই তো।

বালক মৃদুকণ্ঠে কহিয়াছিল, "আম্মা দেখলে বকবেন, আপনাদের ঘরে আসতে মানা কিনা। একটু কথা বলুন না।" কিশোরীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু নির্ঝর ছুটিল, সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বস ভাই।" সহসা একটি স্থূলকায় চাকরাণী আসিয়া ঘাড় কাত করিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "আ আমার কপাল! আমি রাজ্যি খুঁজে হয়রান! আর আপনি এখানে? সে কথা মনে নেই বুঝি?" বালকের মুখ শুকাইয়া উঠিল, তবুও সে নব-বধূর সম্মুখে একটু নির্ভীকতা দেখাইয়া বলিল, "যা যা অত ফাজলামো করিসনে।" "আমি ফাজলামো করি! আচ্ছা বলিগে তবে আম্মার কাছে," বালক আর কথাটি না কহিয়া নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

এমন ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। তবুও দেখা যাইত এই দু'টিতে রৌদ্র-দীপ্ত মধ্যাহ্নে, ছায়া শীতল বৃক্ষছায়ায় বসিয়া নানা উপায়ে আহরিত টককুল ও কাঁচা পেয়ারার সদ্ব্যবহার করিতেছে। কোন কোন দিন বোনটি সযত্নে নানা-প্রকার আহার্য প্রস্তুত করিয়া ভাইটির প্রতীক্ষা করিত, চোরের মত দু'একবার তাহাদের বাড়ীর দিকে উকিঝুঁকিও দিত, হঠাৎ দুরন্ত বালক দমকা হাওয়ার ন্যায় ঘরে ঢুকিয়া মাটিতে লুটাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, "আম্মাকে এমন ঠকিয়েছি আপা! এমনিতো আসতে দেবে না, তাই পায়খানায় যাব বলে বদনা নিয়ে এসে বদনাটা পায়খানায় রেখেই চম্পট দিয়েছি।" কিশোরী বোনটি এক মুহূর্তে প্রবীণার ন্যায় গম্ভীরা হইয়া বলিত, "ছি ভাই!—মাকে ফাঁকি দিতে নেই, মার সঙ্গে মিথ্যে বললে আল্লা রাগ করেন!" বালক শংকিত নয়নে মিটিমিটি চাহিত। তখন বোনটি বলিত "আচ্ছা আজ যা

পরে মাফ চাইলে আল্লা মাফ করবেন, আর কখ্‌খনো অমন কাজ করো না।" এই রকম কত ছোটখাট ঘটনা। স্বামী ইহাতে সন্তুষ্টই হইতেন; তার নিজেরও আর কেউ ছিল না, বধূটির তো চতুর্দ্দিকই শূন্য।

আজহারের পিতা মৃত্যুকালে বড় বিশ্বাসে একমাত্র পুত্রটিকে ভাইয়ের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, তা পিতৃব্য কর্ত্তব্যের ত্রুটি করেন নাই, সে সেকেণ্ড ক্লাশে থাকিতেই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, বলিলেন "ও জমিদারের ছেলে জমিদার, লেখাপড়ার জন্য কষ্ট করবে কোন দুঃখে?—নিজের যা আছে তাই-ই বুঝে নিতে শিখুক'" ফলে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আজহারকে সেরেস্তার সিংহাসনে বসান হইল, কিন্তু আমলাদের উপর গুপ্ত নিষেধ রহিল কেহ যেন কোন দলিলপত্র তাহাকে না দেখায়, তবুও বালক বুদ্ধিবলে অল্পদিনেই বুঝিল যে তার নিজের বড় বেশী কিছু নাই, সবই বাকী খাজনার দায়ে নিলাম পড়িয়াছে. বেনামীতে রাখিয়াছেন ওই ভ্রাতুষ্পুত্রবৎসল পিতৃব্য।

আরো কিছুদিন গেল, সহসা একদিন ঝড় উঠিল, জমিদার সাহেব ভ্রাতার নাম করিয়া আফসোস করিতেই বালক আজহার তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর মায়াকান্না কাঁদবেন না চাচা সাহেব। বাবার শোক আমাকে তো পথের ফকির করিয়াছেন।" তার অল্পদিন পরেই পিতামাতা এবং সহায়সম্পদহীনা বনিয়াদী বংশের কন্যা এই বধূটিকে ভ্রাতুষ্পুত্রের গলায় গাঁথিয়া আম বাগানের ওপারে একখানা গৃহ এবং কয়েকখানা জমিপত্র দিয়া বলিলেন, "তোমাদের সবই এতে রইল"—লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "আজকালকার দিনে এত কেউ করেনা। ভাই যেমন সঁপে দিয়েছিল তেমনই লেখাপড়া শিখিয়েছি, বিয়ে দিয়ে সংসারীও করে দিয়েছি", সবাই বলিল, "ঠিক তো।"

তারপরে বালক জমিদারের জমিদারী ছ'মাসের মধ্যেই উড়িয়া গেল, কেননা বেশী কিছু তো ছিল না। যখন সম্পত্তি পাওয়া গেল তার একমাস পরেই সূর্যাস্তের লাট, অত টাকা আসে কোথা হইতে?—পিতৃব্য বলিতে

লাগিলেন "আমি কি করব ?—ওর নসীবে নেই, নাহলে আমি তো সব চক্ চিরে বুঝিয়ে দিয়েছি, জমিদারী রাখা কি এসব ছেলে ছোকরার কাজ ? —এবারও বিজ্ঞব্যক্তিরা মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব ঠিক।" পরের বৎসর আল্লাহ্‌তালার আশীর্ব্বাদের মত—ফুলের মত ছোট্ট ও সুন্দর ফরহাদ আসিল, তরুণী মা'টি লজ্জা-রক্তিম মুখে স্বামীর পানে চাহিল, নব-জাগ্রত স্নেহ-ভরা অন্তরে তরুণ পিতা শিশুর মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, কি সুন্দর।—পরের দিন ভাই আতাহার আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ওগো আপা! কি সুন্দর পুতুলের মত বাচ্চা। ওকে আমি নেব "একটু পরেই অভিমানভরা সুরে বলিল, "এবার আমাকে কম আদর করবেন নাতো ?" "না-রে পাগলা'' বলিয়া সে স্নেহময়ী বড় বোনটির মতই মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছিল।

তারপর কত দুঃখের দিনও গিয়াছে, আতাহার পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। একটা দোকানে হিসাব লিখিয়া সে মাসে দশটি টাকা পাইত, আরও দু'চার জায়গায় ছেলে পড়াইয়া কায়ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিল। তবু—কি সুখেই যে ছিল তারা ? বাহিরের অনটনের দুঃখ এবং প্রাচুর্যের সুখ এই দুয়ের মধ্যে কে যে জয়ী হইয়াছিল তাতো তার অজানা নাই।

ষোলটা বৎসর ঠিক যেন ষোলটা মুহূর্তের মত চলিয়া গেল, বিদায় বেলায় আজহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আর সময় নেই মেহের। বড় সুখেই জীবনটা কাটল, সব সময় আল্লাহতালার উপর নির্ভর করো, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও করুণাময়, তাঁর কাছে কেউ বিমুখ হয় না, ফরহাদ ঘুমিয়েছে, ওকে জাগিয়োনা, যেমন ক'রে পার মানুষ করার চেষ্টা ক'রো—বিনা চিকিৎসায় অকালে আমার দিন ফুরিয়ে গেল, অথচ আমার সবই ছিল, আছে। মানুষের উপর নির্ভর করো না, কারো কাছে হাত পেতো না। বিশেষতঃ ও বাড়ীতে, আতাহারের উপর কত আশা করেছিলে, সম্পদের নেশায় সেও সব ভুলে গেল। প্রতিজ্ঞা কর কখনো ওদের কাছে কিছু

চাইবে না, না খেয়ে মরলেও না"—চোখের পানিতে ভাসিয়া মেহের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। আজহারের মুখেও বড় সুখের হাসিই ফুটিয়াছিল।

আম্মা ? মা ?"

অতীতের রূপসী মেহের কল্পনায় মিলাইয়া গেল, অকালবৃদ্ধা জননী স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় উত্তর দিল, "কেন বাবা ?" "সারাদিন এমনি না খেয়ে থাকবে ? তার চেয়ে বরং রহমতের মাকে ডেকে ও বাড়ীতে পাঠাও না। "মার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বর্ষিত হইল, তীব্র কণ্ঠে শুধু বলিল "ফরহাদ"।"

"আজ ঈদ নয়"

"কে বলেছে ?"

'কাল মেঘের জন্য কিছু দেখা যায় নি, সবাই ভেবেছে চাঁদ উঠেছে বুঝি, আজ কলকাতা থেকে তার এসেছে কাল ঈদ, আজ উঠবে চাঁদ।

"এত পোলাও, কোর্মা, ফিরনী, জরদা যে রাঁধা গেল—এগুলোর কি হবে ?

"আরে তাকি পড়ে থাকবে ?"

"আচ্ছা ঈদ যদি নাই হবে তবে ওদের কাপড় চোপড়গুলি একটু বদলে আনুক না।

"আবার কি বদলাবে ?"

"হেনার শাড়িটা ফিকা হলদে রং এনেছে, ফিকা নীল কি সবুজ হলে ভাল হ'তো, ও ফরসা তো, আর শিউলি একটু ময়লা, ওরই কাপড় এনেছে ঘন নীল, ওটা আনুক গোলাপী।

জমিদার সাহেব ও বেগম সাহেবা কথা বলিতেছিলেন। বেগম সাহেবা দেখিতে ও মন্দ নন, বেশ ফরসা রং, দোহারা শরীর, বয়স তেইশ চব্বিশ। যাইতে যাইতে সহসা মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ওই যা! ভুলে গেছি ও বাড়ীর ফরহাদের নাকি বড় অসুখ, ওদিকে চিকিৎসা দূরে থাক পথ্যও চলে না।" কেন চলবে না ? বাপ তো শুনি বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আমাদের কত

বিষয় পর্যন্ত উড়িয়ে দিল, তা মা'টির হাতে কি কিছু জমাও নেই," আমি তো জানিনে কি হ'য়েছে না হয়েছে, এ বাড়ীতেই যা বদনাম, না হ'লে গাঁ শুদ্ধ লোকে ভাই সাহেবের তারিফ করে আপাকেও তো মন্দ লাগে না।"

আপার নাম স্মরণে সহসা আতাহারের মনের বদ্ধ ঘর যেন এক ঝলক প্রভাত কিরণে প্লাবিত হইয়া উঠিল, কত দিনের সেই স্মৃতি। একটি বোন ও একটি ভাই। সেই স্নেহে কোমলা ও কর্তব্যে কঠোরা আপা! সেই ফুলের পুতুল ফরহাদ। আজতো তাহাদিগকে সে মনেও করে না, কত জঞ্জালের আবরণে তাহাদের স্মৃতি চাপা পড়িয়া গিয়াছে, আপাওতো একটু খোঁজ নেয় না, সেকি অভিমান করিয়াছে? অভিমানিনী বোনটি, সে ডাকিলেও কি আসিবে?

"ফরহাদ!"

"মা!"

"উঠে বসতে পারবিনে বাবা?"

"না আম্মা বড় দুর্ব্বল লাগে, আলোটা আড়াল কর, আঁধার বেশ মিষ্টি, ওমা চেয়ে দেখ ওই বনটায় কেমন জোনাকি জ্বলে, ঝিঁ ঝিঁ গুলি ডাকে, ওরা যেন ডাকে "আয়" 'আয়," কি যেন কখন ফেলে এসেছি, বলে "খুঁজে নিবি আয়।" আচ্ছা, আমি মরে গেলে অমনি বনে রেখে দেবেতো? গোরস্তানটায় বড় জঙ্গল হয়েছে।"

"ফরহাদ!" বাবা জানিস্‌নে কি এসব বললে আমার কত কষ্ট হয়?"

"হোকনা একটু, আমিতো চিরদিন তোমাকে কষ্টই দিয়েছি। আজ যাওয়ার সময় আর অন্য কি দেব?"

"আমি না যেতেই তুই যাবি?"

"সময় হ'লে কি করব? ডাক পড়ল যে, কত দুঃখ যে তোমার অদৃষ্টে আছে। বাবা চলে গেলে কত কষ্ট ক'রে নিজ হাতে গাছ গাছরা লাগিয়ে, সেলাই ক'রে এতদিন কাটালে। আমা হ'তেও তো কোন সাহায্য পাওনি,

মন দিয়ে শুধু পড়েছি আর ভেবেছি এতেই তোমার দুঃখ ঘুচবে, এখন দেখি সব ভুয়া, মানুষ চোর হয় কেন, ডাকাতি করে কেন কিছু বুঝেছ? আমি বেঁচে থাকলে যারা পরকে ঠকিয়ে কোর্মা পোলাও খেয়ে, ভুঁড়িওয়ালা হয় তাদের ভুঁড়ি কেটে টাকা বের করে আমার মত দুঃখীদের দিয়ে দিতাম, একে অন্যায় বল আর যাই বল। নইলে কেউ পোলাও কোর্মা নর্দমায় ঢেলে দেয়, কেউবা তিন দিনেও খেতে পায়না কেন? চিরদিন জেনে এসেছি স্রষ্টার বিচারে কোন ভুল নেই, কিন্তু—"

"ওরে ওই বিশ্বাসেই যে তৃপ্তি আর শান্তি মেলে!"

"তা মিলতে পারে, কিন্তু ভাত যে মিলে না এটা ঠিক, এই যে দুনিয়া জুড়ে হাহাকার উঠেছে, "অন্ন চাই" "বস্ত্র চাই"—কেন তা মিলে না?

"যখন সময় হবে মিলবে, সময় হয়নি তাই মিলে না।"

"হাঁ খুব সত্যি কথাইতো। টাকার চাপে কতগুলি লোক হাঁফিয়ে উঠছে, অথচ তাদেরই চোখের সম্মুখে অসংখ্য প্রাণী "হা অন্ন" "হা বস্ত্র" বলে কবরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে, আর সময় হবে কখন?"

"তারা হয়ত সময় থাকতে শক্তির অপব্যবহার করে, তারপর অসময়ে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। যেদিন লোকে শক্তি ও সময়ের মূল্য বুঝবে এবং সদ্ব্যবহার করতে শিখবে সেদিনই অনেকটা দুঃখ ঘুচবে।"

"ঠিক কথা।"

"আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় তো এটুকুই বুঝেছি,—আর বাজে বকিস্‌নে বাবা, মন খারাপ কোরে কি লাভ? তুই নিজে মানুষ হ, প্রত্যেকে যদি নিজের ঘরের দুঃখ ঘুচাতে চেষ্টা করে তাহলেই তো দুনিয়ার অভাব অনটন ঘুচে যায়।" "না আম্মা! নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপরের দুঃখও মোচনের চেষ্টা করা উচিত। বড় দুষ্টু হয়েছি আমি, তোমার সঙ্গে তর্ক করি,—না? আচ্ছা আর কথা বলব না, তোমার পা দুটি আরও কাছে আন, আজকাল

তো শুধু পায়ে বেড়াও—তবুও কি নরম ! যেন একরাশ ফুল, তোমার চোখ দুটি মাগো ভোরের তারা।”

সম্মুখে কতকটা পড়ো জমি, তাতে কতকালের দুই চারিটা শুষ্কপ্রায় গাছ, তার পরেই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত অনেক দূরে দু’একটা আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। ছেলের চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মা সেই দিকেই চাহিয়াছিলেন। রুক্ষ চুলগুলি মুখের চতুর্দিকে উড়িতেছে। সন্ধ্যা তারার ন্যায় চোখ দুটি বিষাদে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। তিনি ভাবিতেছিলেন অল্পক্ষণ পূর্বে ছেলে যে কথাগুলি বলিয়াছিল তাই--সত্যই তো দুনিয়াতে কেহ অতিরিক্ত সুখী আর কেহ অতিরিক্ত দুঃখী কেন ? মানুষ মাত্রেই একে অপরের ভাই, কেহ সেকথা ভাবে না কেন ?

“আম্মা” ?

আবার চিন্তার স্রোতে বাঁধা পড়িল, মা উত্তর দিলেন “কি বাবা”। “তোমার হাতটা আমার গায়ে দাও—আজ যেন মনে হচ্ছে তুমি অনেক দূরে বসে আছ, আচ্ছা—তুমি না বলেছিলে ও বাড়ীর ছোট চাচাকে তুমি খুব ভালবাসতে—তাঁর সাহায্যও কি নেওয়া যায় না ?” “না বাবা, অভাবে পড়লে কোন আত্মীয়ের সাহায্য নেওয়া যায় না। বরং পরের কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়া যায়। যখন সে ছোট ছিল একদিন বলেছিল, সে বড় হয়ে নাকি তার বাড়ীতে আমাদের সকলকেই নিয়ে যাবে। তোমাকে বিয়ে দিয়ে পরীর মত বৌ আনবে, কত কি বলত, আর একবার—বছর দশেক আগে—তোমার বাবার অসুখ হওয়ায় অনেক মিনতি করেছিল যেতে”—“গেলে না কেন ?” “সময় হয়নি বলে যাইনি, তাকেও ঠিক এই কথাই বলেছি, যেদিন সে মনের সমস্ত মলিনতা মুছে ফেলে বংশগত বিদ্বেষ ভুলে ছোট্ট ভাইটির মত হবে সেদিনই সময় হবে,—যাক—সেদিন না-ও আসে এইটুকুই আল্লাহ্‌তা’লার কাছে চাই যেন কারো অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে না হয়।” “সেদিন আসবে না আম্মা, গরীব কোনদিন বড় লোকের কাছে আত্মীয়তার দাবী করতে পারে না

যদি তার গায়ে জোর না থাকে।" "এত কথা তুই কোথায় শিখলিরে?" "এই সহজ সত্যটাও কি কারো কাছে শিখতে হয়? এই তো চোখের সামনে বড় মানুষ ভাই—বিষয় সম্পত্তি সব থাকতেও বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, আমারও আজ সেই অবস্থা, কিন্তু ওই জমিদারীর অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী যে আমাদের!"

"সবই জানি, কি করব বল?" "তাই হক্—আর তো কোন বন্ধন তোমার থাকবে না, মিথ্যা মায়ায় কাজ কি, চাচা যদি কোনদিন সাহায্য করতেও চান সে ভিক্ষা নিও না।" "আচ্ছারে তাই হবে, এখন তুই একটু চুপ করে থাক, মুখ শুকিয়ে যাবে যে!—কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। আমি নামাজটা পড়ে নি—"

"আমাকে একটু বুকে নাও মা"—"কেনরে? আজ আবার বাচ্চা হয়ে গেলি নাকি?" মা'র বুকে মাথা রাখিয়া অপলক দৃষ্টিতে সে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সেই দেখাটুকু বুঝি তার দীর্ঘ পথের পাথেয়! "একটু পানি!" খাও,—ও কিরে?—পানি পড়ে যায় কেন?" "কিছু না আম্মা, আমার মাথাটা উত্তরদিকে করে দিন, কিচ্ছু হয়নি মনে আছে তো—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন" সকলেই তাঁর কাছে যাবে তো একদিন, তবে আর দুঃখ কিসের?"

"বাবা! ফরহাদ!"

"মাগো সন্ধ্যা হলো বুঝি—আমার সামনের জানালা খুলে দাও—আমি আকাশ দেখবো—আজ না ঈদ—ঈদের চাঁদ এসেছে আমার জন্যে না আম্মা—"

অনাথিনীর বুক দুলিয়া উঠিল; কাতরস্বরে সে ডাকিল ফরহাদ!"

ফরহাদের চোখে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল—নির্জ্জন মরু-প্রান্তরে যেমন ধীরে নিঃশব্দ চরণে রাত্রি নামিয়া আসে। ফরহাদের সমস্ত শরীর একবার শুধু কাঁপিয়া উঠিল! তাহার পর দুই কম্পিত কর চাঁদের শীর্ণ রেখাটির দিকে একবার নড়িয়া পড়িয়া গেল!

মেহেরের বুকে অশ্রুর সাগর গর্জিয়া উঠিল।

এমন সময় দূরে অস্পষ্ট কোলাহল শুনা গেল, যেন আনন্দ-ধ্বনি, বেড়ার ফাক দিয়া একটা বাতি দেখা গেল, ক্রমে নিকটে আসিল, যে আসিয়াছিল সে দুয়ারের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, উৎকর্ণ হইয়া একটু প্রতীক্ষা করিল, তারপর ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ফরহাদ ঘুমিয়েছে বুঝি? যাক—টাউনে লোক পাঠিয়েছি, ভোরে সিভিল সার্জ্জন নিয়ে ফিরবে—ও সেরে উঠলে আপনাকে শুদ্ধ ও বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই, ও'র লেখাপড়ার ভাল রকম বন্দোবস্ত করতে হবে,—অমন করে চেয়ে রইলেন কেন?—ঈদের চাঁদ উঠেছে কিনা তাই সালাম করতে এসেছি, আজকের দিনে আমাকে মাফ করে দিন আপা? ছোট ভাই'র দোষ কি মনে করে রাখে?—আজ নিশ্চই আপনার কাছে এতদিনের বে-আদবীর বদলে স্নেহই পাব, এখনও কি সময় হয়নি?

মা স্থিরদৃষ্টিতে মৃতপুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। উদাস করুণ দৃষ্টি তুলিতেই চোখে পড়িল চন্দ্রলেখা! ঈদের চাঁদ! হায়রে ঈদ!

দুই কান ভরিয়া বাজিতে লাগিল সেই যুগ-যুগান্তরের ব্যথা ভরা অমর বাণী—গরীব কখনো বড়লোকের কাছে আত্মীয়তার দাবী করতে পারে না, যদি তার গায়ে জোর না থাকে।

জোর গায়েও নাই, মনেও নাই, সব দেনা-পাওনা তো ফুরাইয়াই গেল। শূন্য তহবিলে আর কিসের কারবার? অস্ফুটকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মাফ?—মাফ তো বহু পূর্বেই করেছি ভাই, কিন্তু তোমার সাহায্য নেওয়ার সময় আর এ জীবনে হবে না, ফিরে যাও, পথ ফুরিয়ে এসেছে। এ সময় আর পথভ্রষ্ট করো না। দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করো, সেই-ই আমার সেবা হ'বে।

ক্রমশঃ রাত্রির গাঢ়তায় চাঁদ ডুবিয়া গেল।*

---

* মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃঃ ৬৭০-৭৪।

এ মরু কারবালায়

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"তোমার বাড়ী কোথায় ? তোমাকে কে এনেছে ?"

নবীপুর জমিদার বাড়ীর দেউড়ির সম্মুখে একটি পর্দাবগুণ্ঠনবতী ছিন্ন মলিন-বেশা যুবতী দাঁড়াইয়াছিল। দাস, দাসী, ছেলে মেয়ে সকলেই এই প্রশ্ন করিতেছে। কিন্তু কেহ বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না বা অধিক প্রশ্নও করে না, কেননা এতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, হয়তো পেটের দায়ে নিজেই আসিয়াছে, নতুবা কোন পেয়াদা বা খানসামা অথবা অনুগত প্রজা কাহারো বৌ ঝি ভুলাইয়া আনিয়া বিক্রি করিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে একটি মেয়ে আসিয়া "ভিতরে চল, বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া লইয়া গেল। জমিদার গৃহিনীর সম্মুখে নিয়া বলিল—"এই যে আম্মা একটি নতুন মানুষ, চাকরের কাছে নাকি বলেছে ও এখানে থাকবে।"

গৃহিনীর বয়স চল্লিশের কম নয়। দেখিতে বেশ সরল হৃদয় ও বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে হয়, তিনি বলিলেন —"তুমি কে মা ?"

সহানুভূতিপূর্ণ কথায় মেয়েটির মন আরও গলিয়া গেল—সে উচ্ছসিত কান্না রোধ করিয়া বলিল—"আমি বাড়ীর বের হইনি—ভিক্ষাও করতে পারব না, আমাকে একটু ঠাই দিন"—কথা বলার সময় সে মুখের কাপড় সরাইল, সকলেই মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল, স্নিগ্ধ গৌরবর্ণা সুগঠিত দেহ সুন্দরী সে। মুখে চোখে এমন একটা পবিত্র ভাব ছিল যে সে রূপ দেখিলে স্নেহ, করুণা ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, বয়স কুড়ি হইতে পঁচিশের মধ্যেই,। গৃহিনী মনে মনে ভাবিলেন—"আমার ছেলেগুলি বড় হইয়া উঠিতেছে—আমি রূপের ডালা লইয়া কি করিব ?" প্রকাশ্যে বলিলেন—"তোমার কি কেউ নেই ?" "থাকবে যদি তবে আর এ বরাত কেন আম্মা ? আমি যেন বিষের লতা,

যে ডাল ধরেছি—তাই পুড়ে গেছে। বুদ্ধি না হতেই বাপ গেছে, বিয়ে হলে ছুটি ছেলে হ'য়ে স্বামী গেল, এক বছরের মধ্যে ছেলে ছুটিও গেছে। দেওর ভাশুরে তাড়িয়ে দিল, বুড়ো মা ভিক্ষে করে কয়দিন খাইয়েছে—সেদিন সেও গেল, আছে শুধু দশ বছরের একটি ছোট ভাই। তাকে তালুকদারদের বাড়ীতে কাজ দিয়ে এসেছি, গরু চরাবে আর খাবে, বছরে ছ'খান গামছাও পাবে, আমি কোথায় যাই এখন? ভেবেছিলাম বাড়ী বাড়ী কাজ কর্ম করে নিজের ঘরে এনে রেঁধে খাব, তবু বাপের ভিটায় চেরাগ জ্বলবে, তা আর এ পোড়া নসিবে হল না। যেখানেই যাই কত রকম কথা যে লোকে বলে— অন্য বিয়ে করলে না কেন?" 'আপনি মার মত—আপনার কাছে, কোন সঙ্কোচ করব না, যে বিয়ে করবে সে যদি ছুদিন পরে তাড়িয়ে দেয়? যারা বিয়ে করতে চায় সকলেরই ছেলে মেয়ে আছে, বৌ আছে। আমার চির-দিনের আশ্রয় না হলে অমন ছু'দিনের স্বামী দিয়ে কি করব? তাই মনে করেছি, কোন ভাল জায়গায়—ভাল লোকের কাছে খেটে খাব।'

মেয়েটি যখন এইকথা বলিতেছিল তখন মুক্তাফলের মত অশ্রু বিন্দু তাহার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। গৃহিণীর মন আপনা হইতেই কোমল হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "দেখ বাপু ভাল আর মন্দ সবখানেই আছে। তুমি যদি ভাল হও, মন্দ জায়গা আর মন্দ লোক তোমার কিছুই করতে পারবে না। এখানেই থাক আর এই কথাটা মনে রেখো কেমন?

"আচ্ছা।"

(২)

বিশ বছরের পরের কথা,—পূর্ব্বের মত একই নিয়মে সময়ের গতি প্রবাহিত হইলেও মানুষগুলিও তাহাদের অবস্থা সবই বদলাইয়াছে। সে দিবসের সেই যুবতী জরিনা এখন প্রৌঢ়া,—সে মাতৃসমা জমিদার গৃহিনীর কথার সম্মান রাখিয়াছে। জমিদার গৃহের দাসদাসীদের কলুষিত সংসর্গেও

তাহার চরিত্রে একটুকুও কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই, মন্দ চরিত্রের লোকেও তাহার সম্মুখে সৎভাবের পরিচয় দিতে পারিলে সুখী হইত, গৃহিনী আছেন তাঁহারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, কয়টি ছেলে মেয়ে অকালে মারা গিয়াছে, স্বামীও বহুদিন পূর্বেই বেহেশ্‌তবাসী হইয়াছেন। জরিনার ভাইটি উপার্জন-শীল হইয়া তাহাকে বাড়ীতেই রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বহু সুখ দুঃখজড়িতা ও স্নেহপাত্রী জরিনাকে গৃহিনী ছাড়িতে রাজি হন নাই। জড়িত লতাটিকে ছাড়িতে বৃক্ষেরই বুঝি এম্‌নি ব্যথা লাগে।

গৃহিনীর সেই বড় হইয়া উঠা ছেলেগুলিও এখন সন্তানের পিতা ও গৃহকর্তা হইয়াছে। তাহারাও জরিনাকে ভাললোক বলিয়াই জানে, দিন একরকম মন্দ যাইতেছিল না, মনিব বাড়ীর শিশুগুলিকে জরিনাই মানুষ করিত। মাদের চেয়ে সে বেশী খাটিত, ভাইয়েরও ছেলেমেয়ে হইয়াছিল, বাপের ঘরে আবার বাতি জ্বলিতেছে, ভাই সংসারী হইয়াছে, জরিনা ভাবিল এতদিনে বুঝি আল্লাহতালা তাহাকে সুখের মুখ দেখাইলেন। কিন্তু এ সুখও স্থায়ী হইল না। একদিন শরতের প্রভাতে পল্লীলক্ষীর শ্যামাঞ্চল যখন সোনার রঙে ভরিয়া উঠিয়াছে,—কৃষকদের বুকভরা হাসি—সেই আনন্দের দিনে এত দুঃখে মানুষ করা ভাইটি জরিনাকে ছাড়িয়া গেল, এত দিন যাবৎ অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। তবুও ধান কাটার সময় খাটিতে পারিলে অপোগণ্ড শিশুগুলির কয়েকদিনের সংস্থান হইবে; এই আশায় সামান্য অসুখ গ্রাহ্যও করে নাই, পঞ্চম দিনে বুকজোড়া নিওমোনিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। সপ্তম দিনে শীতের ক্ষণস্থায়ী রৌদ্রটুকুর মতই তাহার আয়ু শেষ হইল। রহিল স্ত্রী, চারিটি ছেলে মেয়ে ও জীর্ণ ঘরখানা।

বাপের ভিটায় যে চেরাগ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—আবার তাহা নিভিল। ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুস্পুত্র চারিটির অন্নের সংস্থান, বস্ত্রের সংস্থান তাহারই করিতে হইবে। নিরুপায় নারী সে। বিশ বৎসর বড় মানুষের বাড়ীতে কাজ করিলেও একটি পয়সাও সে জমাইতে পারে নাই। এখন কোথা হইতে কি

জুটিবে। একটি নারী পাঁচটি প্রাণীকে কি করিয়া প্রতিপালন করিবে, অসহায়ের সহায়—অগতির গতি যিনি, তিনি আছেন। যেমন করিয়া হোক পিতার বংশ রক্ষা করিতে হইবে, ছেলেমেয়েগুলিকে বাঁচাইতেই হইবে। এই কথা ভাবিয়া সে আশায় বুক বাঁধিয়া পুরাতন মনিব জমিদার গৃহিনীকে বলিল—"আম্মা! আমার ভাইয়ের বউটিকে এখানে রাখবেন?" আপনাদের কাজকর্ম করবে। গৃহিনী তখন নামমাত্র গৃহকর্ত্রী, কাজেই বলিলেন, "আমি তো বলতে পারিনে মা, বৌরা যদি বলে তো এনো।" বধূরা কিন্তু এই চারি সন্তানযুক্তাকে রাখিতে রাজি হইল না, বলিল, "ছেলেমেয়েদের কিচকিচিতে টেকা দায় হবে, ও নিজের ছেলেমেয়ে রাখবে না আমাদের কাজ করবে? দরকার নেই এমন মানুষের।"

দুই চারিদিন মনিব বাড়ী হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া গেল, কিন্তু নিত্য দেয় কে? শেষে জরিনা নিজে আধপেটা খাইয়া অর্ধেক ভাত ছেলে-মেয়েগুলিকে খাওয়ান আরম্ভ করিল, কোন কোন দিন বৌটি এক আঁধ মুঠা পাইত, কোনদিন শাকপাতা সিদ্ধতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইত।

অনাহার-জীর্ণ শরীরে রোগ সহজেই প্রবেশের সুযোগ পায়, তাই দুই মাসের মধ্যেই একটি ছেলে জ্বর ও উদরাময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার অতীত স্থানে চলিয়া গেল।

(৩)

মহরমের দশ তারিখ। কারবালার বিষাদময় স্মৃতিকে জাগরুক করার জন্য সর্ব্বত্রই নানা অনুষ্ঠান চলিতেছে। তবে তাতে আনন্দের ভাবটাই বেশী, সহরে বড় লোকেরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় এক একটা মিছিলের আয়োজনে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছিল। একবার এক এজিদ উৎপীড়ন করিয়াছিল সেই স্মৃতি সজাগ রাখিতে এত চেষ্টা—অথচ আল্লাহ্‌তালার সৃষ্ট জীব কত দিকে কত রকমে উৎপীড়িত হইতেছে সে খবর কে রাখে? উৎসবের

অপব্যবহারে অনাথের অশ্রুজল ভাসিয়া যায়। চিরন্তন প্রথানুযায়ী নবীপুর জমিদার ভবনেও উৎসবের আয়োজন চলিতেছে,—বহু আত্মীয় আত্মীয়া নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন তাহাদের হাস্যালাপ ও গল্প-গুজবে গৃহ মুখরিত. কাজের ঝঞ্জাটে জরিনা সকালে ভাত দিয়া আসিতে পারে নাই। কাজকর্ম করিতেছে, কিন্তু তাহার চোখের উপর ক্ষুধিত শিশুগুলির চেহারাই ভাসিতেছে। একবার ছুটি নিতে চাহিয়াছিল। তাতে মনিব উত্তর দিয়াছেন, "এ বেলা তো আর যেতে পারবেনা, এত কাজ ফেলে কি করে যাবে? ও বেলা যেও।"

সে বলিয়াছিল, "ছেলেপিলেগুলি না খেয়ে থাকবে যে। তাহলে কাউকে দিয়ে কিছু পাঠিয়ে দিন। "মনিব উত্তর দিয়াছিলেন," সবাই কাজে, কাকে বা পাঠাই। না না, সে সব হবে টবে না,—ও এক রকম করে চলে যাবে।"

জরিনা ভাবিল, কাহারও নিকট হইতে কিছু পয়সা চাহিয়া লইয়া পাঠাইবে, কে দিবে? সহজে সে কাহারও নিকট চাহিতেও পারিত না, যদি না দেয়; এই লজ্জাটাই তাহাকে বেশী পীড়া দিত। অনেক ভাবিয়া সে বধূদের ঘরে চলিল। সকলেই কর্মব্যস্ত, শুধু একজন জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বেলা-শেষের ম্লানআভা চোখে মুখে পড়িয়া কি করুণ দেখাইতেছে। তার একমাত্র শিশু পুত্রটি দেড় বৎসরের হইয়া মারা গিয়াছে। সকলে পরিয়াছে মহরমের শোকচিহ্ন কৃষ্ণ বসন, কিন্তু তার পরণে লাল শাড়ী। অন্তরের আঁধারকে পরাজিত করিতেই কি এ অভিমান? না দিবানিশি বুকের রক্ত ঝরার ইতিহাস এ?

এরই কাছে আসিয়া জরিনা বলিল, "বেগম সাহেবা, আপনার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা আছে, আপনার ঘরে চলুন, বধূটির তখন রিক্ততার বেদনায় কান্নার পরিবর্তে দুইচক্ষু জ্বালা করিতেছিল, বুকে যেন লক্ষ মণ পাষাণ, মুখের পানে চাহিলেও সে জরিনার অভাবের কথা কিছু বুঝিতে পারিত।

কিন্তু অন্যদিকে চাহিয়া সে তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "পারব না, এখন যাও।"

সংসার এই রকমই, নিজের দুঃখে অন্ধ হইয়া আমরা কত সময় অন্যের ব্যথাকে পদদলিত করি,—তাই তো সুখ দুঃখ যাহারা সমভাবে গ্রহণ করেন তাঁহারাই মহাপুরুষরূপে গণ্য হইয়াছেন।

বিফলমনোরথ হইয়া সে বাবুর্চিখানায় ঢুকিল, নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে, ঘৃত ও জাফরানের গন্ধে গৃহ আমোদিত, রান্না শেষ হইয়াছে, বড় বড় লগম ও ডিসে জেয়াফতের জন্য খানা লইয়া যাইতেছে। যিনি রাঁধিতেছিলেন তাঁর কাছে যাইয়া চাপা গলায় জরিনা বলিল, "আমাকে কিছু দিতে পারেন বুবু? বাচ্চাগুলি না খেয়ে রয়েছে।" সে বড় গলায় বলিল, "আমি পারব না বাপু সাতগুষ্ঠির বাড়তি এমনি কোমর ব্যথা হইয়া গেছে, তোমাকে দিলে সবাই হেঁকে ধরবে!"

পূর্ণ একটা দিন কচি শিশুগুলি অনাহারে রহিয়াছে, যদি তাহার স্বামী থাকিত! বাইশ বৎসর পূর্বের সুখস্মৃতিতে মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। দারিদ্র শতপাকে বেড়িয়াছিল। কিন্তু কোনদিন অযত্ন হয় নাই তার। যেদিন ভাত কম থাকিত সেদিন মরিয়মের বাপ অর্দ্ধেকটা ভাত রাখিয়া দিয়া বলিত, "দেখ, যেখানে কাজ করেছি এমন খাওয়ানটা খাইয়েছে যে তিন দিন না খেলেও কিছু হবে না" এই চির-পুরাতন ফাঁকিটুকু প্রায়ই বলিত। একবার সে শহর হইতে পুরা দেড়টি টাকা দিয়া একখানা লাল শাড়ী আনিয়াছিল, সেখানা পরাইয়া কত আনন্দ। বলিয়াছিল, "সত্যি মরিয়মের মা, তোকে আজ ঠিক লোটন মুরগীটার মতন দেখাচ্ছে, তুই বড় লোকের ঘরে হলে ম্যাজিষ্টেটের বিবি হতে পারতি, নেহাৎ বদনসীব কিনা!" জরিনা ধমক দিয়া বলিত, "নাও নাও আর ঢং দেখাতে হবে না, আজ বাদে কাল, দশ বচ্ছর বাদে জামাই আস্‌বে তখনও এমনি বলো।" হা হা করিয়া হাসিয়া স্বামী বলিত, 'সে যে দশ বচ্ছর পরের কথা রে! সাধে কি আর—"

"ওগো, ও মরিয়মের মা শুনছ? এই পাতিলটার কাছে দাঁড়াও তো আমি একটু আসি, সব বেরিয়ে গেছে। দেখো বিড়ালে খেয়ে নেবে"। সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে পোলাওয়ের পাতিলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, পরিবেশনকারিনী উঠিয়া গেলেন। ঘরে কেহ নাই। তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। বিশ বৎসর যাবৎ এই সংসারে খাটিতেছে সে! অথচ আজ এক মুঠা চাউলের উপর জোর চলিল না, এত আছে, সামান্য দানে তো এতটুকুও কমিত না! মখমলের সুট পরিহিত একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে খানসামার কোল হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া টান দিয়া বলিল, "ঝি মা, কেচ্ছা বলবে চল।"

এক ঝটকা দিয়া সে হাত ছাড়াইয়া লইল। এই আদুরে দুলালেরা দৈনিক চারি সের দুধ খায়! শিশু খানসামার নিকট গিয়া নাকি সুরে বলিল, "ঝি মা মেরেছে"। খানসামাটিও মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, "মাগীর ব্যবহার দেখ"। অন্য সময় হইলে হয়তো সেও দু' কথা শুনাইয়া দিত। কিন্তু এখন দুঃখভারে আনত মন এই অপমানেও সাড়া দিল না।

সে ভাবিতে লাগিল আচ্ছা আমি ত দিনরাত শরীর খাটাই এখন যদি এখান হতে দু'মুঠা তুলে নিয়ে উপবাসী বাচ্চা দু'টিকে খাওয়াই খুব বেশী দোষ হইবে কি? একখানা বাসন আনিল, উদ্দেশ্য কিছু বাড়িয়া মাচার উপর রাখিয়া দেয়। পরে লইয়া যাইবে, চামচ লইয়া হাত বাড়াইয়াও একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "ছি আমি কি চোর?" অন্তরের অন্তঃস্থলেও সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আবার মনে পড়িল অসহায় শিশু দুটির মুখ। বিশ বৎসরের পরিশ্রম! কিনা করিয়াছে সে? সাহস করিয়া দৃঢ় হস্তে দু'চামচ পোলাও তুলিয়া লইল, আবার হাত দিতেই কে যেন বলিয়া উঠিল, "ওমা একি কাণ্ড।"

জরিনা চাহিয়া দেখিল রাঁধুনী টেপার মা আসিতেছে। বাবুর্চিখানায় ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "কি তাজ্জব লো! তবে নাকি শুধু আমরাই

চোর ? এ যে দেখি জেবের ছুরিতেও গলা কাটে !"

"কি হয়েছে ।"

"কি হবে আর দেখে যান" চেঁচামেচিতে বিবিরা সকলেই দৌড়াইয়া আসিল। একটি ছোকরা চাকর দৌড়াইয়া বহির্বাটিতে গিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সংবাদ দিল মরিয়মের মা চুরি করিয়াছে। বাড়ীর মিঞারা প্রথমে বিশ্বাস করিল না, শেষে গোলমাল করিতেছে দেখিয়া ব্যাপার কি দেখিতে অন্দরের দিকে চলিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা ভাবিলেন বুঝি গোলমালে কাহারও গহনা চুরি হইয়াছে। একজন বলিলেন, "আজকাল মেয়ে মানুষ-গুলিরও সাহস বেড়েছে, এসব বাজে লোক অন্দরে ঢুকতে দেয় কেন ?"

বাবুর্চিখানায় তখন অপরূপ অভিনয় চলিতেছে। ছুকরীরা এক একজন আসিতেছে আর নিজেদের সাধু চরিত্রের গুণগান করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছে। একজন নীরব হইতেই অপরা তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, বিবি সাহেবাগণ স্বপ্নাবিষ্টা শ্রোতার ন্যায় গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যাহাকে লইয়া এতকাণ্ড সে কিন্তু প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেন একটি প্রতিবাদ করার শক্তিও তাহার নাই। সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া প্রশ্ন জাগিতেছিল, "মরণ ! তুমি কত দূরে ?" মিয়ারাও আসিয়া পৌঁছিলেন, বিবিদের মধ্যে অনেকে সরিয়া গেলেন। ছুকরীর দল খুব ভারি একটা মজা দেখিবার আশায় চুপ করিল। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না, তাঁহারা ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। কারণ এমন ঘটনা দিবা-রাত্রিই ঘটিতেছে। তা এসব লোক এরকমই তো। বিশ বৎসরের সাধুতা এক মুহূর্তে ভাসিয়া গেল। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। শুধু তরুণ বয়স্ক একটি উগ্র মস্তিষ্ক ছেলের সহিল না। সে বলিল, "বাঃ ! চোরের শাস্তি না দিয়েই সবাই চলে গেলেন যে ! একি তামাসা নাকি ? সবগুলিই তো সাহস পেয়ে যাবে !" একটি বধূ ফোঁড়ন দিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা মিয়া, লতাপাতা চুরি করতে করতে রাজার হাতীও লোকে চুরি করে।" মিয়াটিও

গর্জন করিয়া বলিলেন, "টেপার মা! এদিকে এস, বাঁ পায়ের আঙ্গুল দিয়ে দাগ টান, সেই দাগের উপর নাকে খৎ দিবে যে এমন কাজ করবে না, বুড়ো মানুষ বলে ছেড়ে দিলাম, অন্য কেও হ'লে মেরে হাড় ভেঙ্গে দিতাম—"

গৃহিনী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ছি অমন করতে নেই, বুড়ো মানুষ একবার খারাপ কাজ করেছে, এবার মাফ কর, আর করবে না।" "হু, করবে না, আর সবগুলির যে সাহস বাড়বে? আপনি কিছু জানেন না আম্মা যান তো এখান থেকে, কই টেপার মা শিগ্‌গির দাগ টান।"

সহসা জরিনা পিঠের উপর কার মৃদু স্পর্শ অনুভব করিল, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যাহার নিকট পয়সার জন্য গিয়াছিল, সেই বধূটি, সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এমন কাজ কেন করলে মরিয়মের মা? ক্ষিদে লেগেছিল কি? অশ্রু ও বেদনা ভরা নয়ন সে প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল, প্রথম বারে যাহা বুঝে নাই দ্বিতীয়বারে জোহরা তাহা বুঝিল। তাহার চক্ষু নত হইল, আবার যখন জরিনার পানে চাহিল সে চাহনীতে ছিল অপরাধীর কুণ্ঠা ও দীনতা। এমন সময় বিচারক হাঁকিল, "দাগ কাটা হয়েছে, এস মরিয়মের মা।" সচকিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জোহরা জরিনার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর উঁচু গলায় বলিল, "টেঁপার মা! সকলকে বল আমি পাঠিয়েছিলাম ওকে পোলাও নিতে।"

একটা হাসির গর্‌রা ছুটিল। ননদীয়া সম্পর্কীয় একজন বলিল, "পোলাওয়ের গন্ধে দেখি ভাল মানুষদের জিভে পানি আসে! ও আবার সকলের সামনে বলে ও, সরমও নেই," যে বিচার করিতেছিল সে উগ্রকণ্ঠে বলিল, "মিছে কথা বলতে কারোর মুখে আটকায় না, এতদিন মনে করতাম মেয়ে মানুষ শিক্ষিতা হ'লে একটু ভাল হয় বুঝি, দূর! সব সমান।"

বধূটির ঘরে গিয়া জরিনা উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিল। যে জগৎ একমুঠা অন্নের জন্য তার আজীবন সম্মানকে এমনি পথের ধূলায় লুটাইতে পারে—সে জগতের নিকট হইতে সে আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। বধূটি

একটা টাকা হাতে গুজিয়া দিতেই জরিনা তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ক্ষিপ্তের মত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া দেখে শয্যায় দুইটি কঙ্কাল পড়িয়া আছে। ক্ষীণ আর্তস্বরে তাহারা বলিতেছে একটু পানি—একটু পানি—

জরিনার সর্বশরীর তখন কাঁপিতেছিল—সে নিরুদ্ধ অভিমানে বলিয়া উঠিল—"এ কারবালায় পানি নেই—আছে বালু-কণা, পানি কি হবে?"

সে তখন উন্মাদ হইয়া গিয়াছিল। কি করিবে সে আপনি জানে না। তাহার সম্মুখে তখন এক বিরাট মরুভূমি ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহার মধ্যে। তাহারই মত আর এক অসহায়া নারী বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া। সামান্য-সামান্য পানির অভাবে তাহারও সম্মুখে মৃতপুত্র।

মা ফাতেমার মত উর্দ্ধ আকাশের দিকে হাত তুলিয়া জরিনা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এয়, খোদা, আমার সন্তানদের যারা সামান্য পানি থেকে বঞ্চিত করলো—তারা যেন কোনও দিন করুণা না পায়।"

বাহির হইতে নসীপুরের জমিদার বাড়ীতে মহরমের উৎসবের আনন্দ-শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল।

---

* মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃঃ ৬৭০-৭৪।

প্রেম ও পুষ্প

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"লতি! শুনে যাও শিগ্গীর।" "কেন আম্মা?" "আজ তোমার আখতার ভাই সাহেব আস্‌বে। যাও, তোমার লাইব্রেরী ও ছোট কামরাটা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখ; খুব সুন্দর হয় যেন, ঠিক আমার মার কাজের মত।" চতুর্দশী কিশোরীর পাতলা ঠোঁটে হাসির বিদ্যুত খেলে গেল। সে বলে উঠ্‌ল, 'তা'হলে লাইব্রেরীর চাবিটা আগে দিন্ আম্মা।" মা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "তাতো আমি জানি, সেটার গরজই তোমার বেশী; কাজ কিন্তু সুন্দর হওয়া চাই। আর দে'খো আখতারের সামনে যেন বেরিওনা।" "কেন, আম্মা?" এখন বড় হ'য়ে উঠ্‌ছনা? বেরুবে না তো?" "আচ্ছা অতবার বলতে হবে না," বলে অভিমানে ভ্রুকুঞ্চিত করে লতিফা চলে গেল।

আখতার তার পিতৃব্য পুত্র, ছোট বেলার খেলার সাথী,—সাথী বলাটা বোধ হয়, ঠিক হল না, কেন না এই চঞ্চলা মেয়েটি চাইত তার ছবির বই। মেম পুতুলগুলি। এ গুলির সমান করে তাকে নিয়েও খেলা করে। কিন্তু এতটা সম্মানিত পদগৌরব তার সইত না। কাজেই সে যেত সেখানে, যেখানে ফুটে রয়েছে দীঘিভরা পদ্ম কিংবা গাছ ভরা জামরুল। তখন অগত্যা লতিফাও পিছু পিছু দৌড়াত আর মিনতিভরাকণ্ঠে ডাক্‌ত, "ও ভাই! যেওনা ডু'বে মরবে, গাছে কত পিপঁড়ে র'য়েছে কামড়াবে।" এই রকম নিষেধ বোধ তার পৌরুষ গর্ব্বে আঘাত করত, তাই আরও উৎসাহে ছুটে যেত। গাছে উঠলে লতিফাই পিপঁড়ের কথা ভুলে বলতে থাকতো, আমাকে একটা দাওনা।" আখতার সগর্জ্জনে বল্‌তে "আর পিছু ডাক দিবি, রাক্ষুসী? যদি সত্যি কলমী লতায় পা আটকে ডুবে যাই, কিংবা নরম ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাই,

তাহলে বুকদশ হাত হয় না? ডাইনী বিড়ালচোখী! এই সুমিষ্ট সম্বোধনে আট বছরের মেয়েটিও রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলত; খুশি হই'ই তো। কেন এসেছো আমাদের বাড়ী? এবার সব শুনেছি, আমার মাত আর তোমার মা নয়?" "নয়ত তোর বর্ণ বিড়ালী?" এবার অসহ্য ক্রোধে লতিফা ছুটে যেয়ে, মস্ত মুলি বাঁশ এনে খোঁচাতে শুরু কর্‌ত, পা দিয়ে রক্ত ছুটত, তবুও বালক দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকত। ততক্ষণে লতিফার অনুসন্ধানে লোক ছুটত, তাদের কেউ ছুটে বাঁশ কে'ড়ে নিয়ে বল্‌ত, "সাতশো ছালাম আপনাকে, বাবা। কি মেয়ে দেখলি, চামেলী? এ মেয়ে যদি তুরুক—সোওয়ার না হয়তো আমার কান কেটে ফেল্‌ব। আহা! ভাই সাহেব, বেচারার পা দিয়ে রক্ত বের ক'রে দিয়াছে।" এইবার আখতার সব ভুলে বলে উঠ্‌ত, "বেশ ক'রেছে, তোদের কি?" ওরা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠে বল্‌ত, "এত যদি দরদ, তাহ'লে বিয়ে করে ফেল্‌লেই তো হয়, এ দস্যি মেয়েকে যে আর কেউ নেবে না?

সেই আখতার ভাই! হঠাৎ মনে হ'ল আজ, আম্মা কেন আমাকে ওর সামনে যেতে নিষেধ করলেন? বড় হ'লে কি কেউ ভাইয়ের সামনে যায় না? ঘুরে ফিরে সেই কথাই ভাবতে লাগল—ভাইয়ের সামনে যেতে, যেতে নেই কেন? কত বড় আর হ'য়েছে সে? আয়নার সামনে গিয়ে সে নিজের দিকে চাইল, বাস্তবিকই এ যেন আর কেউ, চিরদিন শুনেছে সে রোগা, শুক্‌নো, সুন্দরী নয়। কিন্তু একি! কোন ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শে সে এমন হয়ে গেছে! সর্বাঙ্গে হীরকের ঔজ্জ্বল্য, মুক্তার লাবণ্য, পুষ্পের রক্তরাগ। তাহলে সুন্দরী হওয়াকেই বড় বলে? তা রূপ যে আর কেউ খুটে নেয় না। হঠাৎ মনে হ'ল মানুষের অন্তরে যে রূপ তার সৌরভে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হ'তে পারে, কিন্তু নারীর বাইরের রূপকে পাতায় ঢাকা ফুলটির মতই ঢেকে রাখ্‌তে হয়।

এতক্ষণ ছেলে মানুষের মত কি ভেবেছে সে, এই সোজা কথাটা মাথায় আসেনি। মনটা হালকা হয়ে গেল। ফুলদানীতে একটা বড় ফুলের তোড়া ছিল তারই তৈরী। চামেলী আর গোলাপের পাপড়িগুলি খ'সে পড়েছে; তুলে বইটার এক পৃষ্ঠায় রাখতে লাগ্‌ল। সেটায় কতকগুলি রেখে আর একটি বই টেনে নিল। খুলতেই চোখে পড়ল—

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি,

তারই সঙ্গে সঙ্গে মাতার সমস্ত নিষেধ সত্ত্বেও একটি কথা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল,—আজ সে আসিবে। "বুবু কোথায়? সমস্ত বাড়ী খুঁজেছি, আর এখানে নিজেই ঘরে চুপ ক'রে ধ্যানে বসেছেন" বল্‌তে বল্‌তে তারই বয়সী একটি শ্যামবর্ণা মেয়ে ঘরে ঢুকল। তার মুখ হ'তে সমস্ত শরীরই বেশ গোলালো, তাই লতিফা আসল নাম জাহেরা না ডেকে, ডাক্‌ত "মিঠা কুমড়া।" মা বাপ নেই, ছোটবেলা হতে এ বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। তাদেরই প্রজার মেয়ে সে। কানের কাছে মুখ এনে সে ফিস ফিস করে বল্‌তে লাগল,—আমি ঘুরে দেখে এসেছি ছুটো মোচা হয়েছে গাছে; টুনটুনির বাসায় ছু'টি আণ্ডা আছে; শালিকও আছে, চারিটি বাচ্চা দিয়াছে আর জাম সব পেকে রয়েছে। আরও—হঠাৎ থেমে গিয়ে সে নির্বাক্ বিস্ময়ে লতিফার মুখের পানে চেয়ে রইল, অন্যদিন সে এসব সংবাদে কোন সময় ছুটে যেত। আজ কেমন উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। কতকক্ষণ চেয়ে থেকে ঘাড় কাৎ করে গালে হাত দিয়ে বলে উঠল, "একি! মনটা কি পরিস্থানে গেছে নাকি? এবার বালিকাসুলভ চপলকণ্ঠে লতিফা বল্‌লে। "তুই পরী দেখেছিস্ কখনও?" "দেখিনি, তবে শুনেছি। আমার দাদাকে একবার পরীতে উড়িয়ে নিয়েছিল; চলুন, যেতে যেতে বল্‌ব।"

"দেখেছিস্ কেমন ঝুমকা ফুল? বেশ লাগে দেখতে"। "চলুন বাবার ফুল গাছগুলি দেখে আসি। কি ফুল না আছে, কিরি মিড়ি আম? উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল লতিফা' "দূর বোকা কিড়ি মিড়ি আম কিরে? ক্রিসান্থি-মান।" "ও আমার মুখেও আসবে না, কিড়ি মিড়ি আমই ভাল।"

তাহলে তোর সঙ্গে কথাও বল্‌ব না। বল্ ক্রিমাস্থিমান ফিরিসান্তিম।" "তবুও কতকটা হয়েছে; পারব না বলেই মানুষে পারে না।" "বুবু, সামনে শেয়ালের গর্ত। আল্লা করে ঠাংটা ধরে টেনে নিয়ে যায়।" "ইস্ তা আর নিতে হয় না; শেয়ালই মানুষকে দেখলে পালায় তবে, ছোট ছেলেমেয়ে পেলে মাঝে মাঝে নেয়। জানেন, একবার আমাদের জমিরের বাপের ছেলেকে—" "ওটা কি কথা রে? জমিরের বাপের ছেলে—সোজা জমিরের ভাই বল্‌লেই হয়।" যান, আমরা গায়ের মানুষ অত প্যাঁচ জানিনে।" "আমার কথাটা প্যাঁচানো আর তোমার কথাটা সোজা। নে বল।" "না বল্‌ব না" "না বল্‌লি তো বয়েই গেল।" "ঘাসের মধ্যে কেমন নীল ছোট ছোট ফুল দেখছেন বুবু? আপনার কানে পরিয়ে দিই। বাঃ বেশ চমৎকার হয়েছে। নীল পাথরের এম্‌নি কান ফুল পরলে বেশ মানাবে। ও বুবু? দেখুন কারা যেন আসছেন? মৃদুকণ্ঠে লতিফা বল্‌লে। ঐ ঝোঁপটার পিছনে বসে পড়।" বাগানের সামনের পথ দিয়ে দু'জন লোক ঘরের দিকে গেল।

একটি লতিফার ভাই লতিফ, আর একটি সেই আখ্‌তার। তারা গেলে জোহরা বললো, একটি তো আমাদের ভাই সাহেব, আর একটি কে বুবু?" "আখতার ভাই সাহেব। 'ওমা, অনেক অনেক বড় হয়েছে তো। তাই চিনতে পারিনি। চলুন যেয়ে ছালাম করি।" "না আমি যাবনা।" "তা হ'লে নুন, মরিচ, তেতুল আনি; মোচা দুটি খাওয়া যাক," বলেই সে দৌড়ে চলে গেল; লতিফা দাঁড়াইয়া একটা ফুল ছিড়িতে গেল। আজ ফুল ছিড়িতে গিয়া তাহার হাত কেমন কাঁপিয়া উঠিল। আজ বুঝি লতিফার

মনে সত্যই ফুল ফুটিয়া উঠিল। এতদিন তারা ছিল কাগজের ফুল। সন্ধ্যায় পুকুর হ'তে নামাজের অজু করে আসতে পথে জোহরা বল্‌লে, "আপনার বাতিটা নিয়ে যান।" সে তখন একরাশ হারিকেন, দেয়ালগীর ইত্যাদি জ্বালছে। নিজের প্রদীপটি হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে উপর হ'তে যেন একজন নেমে আস্‌ছে, সে আখতার। একটু কুণ্ঠিতভাবে পাশ কেটে দাঁড়াল। আখতার যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আরও জোরে নেমে গেল।

অভিমানে ছোট মেয়েটির মত লতিফার ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠ্‌ল। একেই না সে আট বৎসর আপন ভাই বলে জান্‌ত, আর আজ সে ভাল আছে কিনা একথাটা পর্যন্ত জিজ্ঞাস করল না। সেও তাড়াতাড়ি উপরে উঠে নামাজে দাঁড়াইয়া গেল। কতকক্ষণ পরে সে যখন মোনাজাত করছিল, তখন কার শ্রান্ত তৃপ্ত হাসিভরা মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল সমস্ত দিনের ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষুব্ধ মনটা তরঙ্গধৌত তটের মতই নির্মল হয়ে গেছে। আখতারের মনে তখন বেশ বিপর্যয় চলেছে! যদিও সে কতদিন হ'তে লতিফার সঙ্গে তার বিয়ের কথা তাদের বাড়ীতে শুন্‌ছে। মনে মনে তাকে ভালও বাসে, তবুও ছ' বছর পরে হঠাৎ তাকে দেখে একটু অবাক হ'য়ে গেল। এই কি সেই কথা? এ সঞ্জিবনী পল্লীবীথি লতাটির মতই প্রদীপ নিয়ে আসছিল। ওকে দেখে মনে হয় যেন দীপান্বিতার উৎসব রজনীর মতই সমস্ত দেহেও আলো। মূর্তীমতি দীপ্তি এ, মনে পড়ল সেই কোকড়া চুলে ঘেরা মুখখানি,—সেই ছোট লতাকে,—যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা জামরুলের জন্য অনুনয় করত, এ যেন সে নয়। ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

লতিফকে ডেকে বল্‌ল, "ভাইজু,' একটা কবিতার বই এনে দাওতো।" মনটা ছিল ভরপুর, তাইও এমন কিছু চায় আর ধরাও অন্তরের ফল্গু স্রোতের সঙ্গে মিশে যাবে। বই খুলতেই একটা মৃদু সৌরভে বায়ুস্তর পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল। সোনার বরণ চাঁপা ও নবানুরাগময়ী কিশোরীর রাঙ্গা গণ্ডের

মত গোলাপের পাপড়ি। কে রেখেছে এ?—বই সামনে খোলাই রইল, সে চেয়ে রইল সেই পাপড়িগুলির দিকে। সব ক'টি পাপড়ি সংগ্রহ করে নিজের বাক্‌সে বন্ধ করে রাখ্‌ল। একটি পাপড়ি সন্তর্পনে ওষ্ঠে ছুঁইয়ে বল্‌লে "তুমি আমাকে দাওনি, তবুও দিলাম।" ভালবাসার নিত্য নতুন রূপ। কিন্তু কিশোর প্রাণের এ রহস্য শুধু অদ্ভুত্‌ নয় অপরূপ; সে শুন্যে মায়াপুরী গড়ে নেয়। মরুভূমিতে স্বর্গোদ্যান রচনা করে। সকাল বেলার পরম বিজ্ঞের মত গম্ভীর হয়ে লতিফ ওর মাকে বল্‌ছে, আম্মা। আখতার ভাই সাহেবের সঙ্গে লতিফার বিয়ে দিন।" মা বললেন, "কেন রে?" ও মুখ আর একটু গম্ভীর করে বল্‌লে "ও তাকে ভালবাসে।'' মা সাশ্চর্য্যে বললেন, "তাই নাকি।'' "হাঁ, আর দেখুন, ওরা দু'জনই দু'জনকে চায়।'' লতিফা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল; রাগে ক্ষোভে দুঃখে সে প্রায় কেঁদে ফেল্‌ল। লতিফ মাকে টেনে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড় করিয়ে বল্‌ল, 'দেখুন, ওর চোখে পানি। এটা নিশ্চয় ভালবাসার লক্ষণ।'' তাও লতিফার কানে গেল। সে দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে মরণের লক্ষণ ব'লে সেখান হতে নিজের ঘরে যে'য়ে অবসন্নভাবে একটা সোফার উপর বসে পড়লো। কেবলেই মনে হচ্ছিল, একি বিপত্তি। দমকা হাওয়ার মত জাহেরা ঘরে ঢুকে বল্‌ল, 'শিগ্‌গীর চলুন, বুবু তিনটে নারিকেল ভেঙ্গেছি, তেতুলের চাট্‌নীও তৈরী হয়েছে, তাতে পুদিনা দিয়াছি।" তৎপর লতিফার দু'হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। বাড়ীর সব ছেলেমেয়ে একত্র হয়েছে। আসন তাদের মাটি, খাওয়ার বাসন কলাপাতা। কলাপাতার একদিকে নারকেল, অন্য দিকে চ'াল ফিরনী। জাহেরা লতিফাকে একটি মোড়ায় বসিয়ে একখানা তসতরীতে চ'াল ভাজা ও নারকেল দিয়ে বল্‌ল, "খিচুরী র'াধতে চেয়েছিলাম। তবে আপনিই এলেন না, কে আর কি করে? আমি একা ক'দিক দেখব্‌? মেয়ে সাজানো হ'তে শুরু করে পান সাজা পর্যন্ত সবই তো আমার করতে হলো।'' লতিফা বল্‌ল "ও পুতুলের বিয়ে বুঝি? কার মেয়ে কার ছেলে?'

একপাশ হ'তে ঝাঁকড়া চুল ফুলো ফুলো গালে চা'র বৎসরের ছোট বোনটি বলে উঠ্‌ল, "ও আপা, আমার ছেলে।" একজন আট বৎসরের বরযাত্রী পরম গম্ভীরভাবে মুখ নে'ড়ে বলে উঠ্‌ল, "এবার যেমন তেমন, ফিরানীতে আমরা পোলাও কোর্মা চাই।" জাহেরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "নিজের দাবী বড় গলায়, আমার মেয়ের যে গয়না একপদ বাকী রয়েছে সেটার কি? যেমন ঠিক দেওনি তোমাদের বউ খালী গলাতেই যাবে। একি হিন্দু মেয়ে পেয়েছো যে মেয়ের মা গয়না দিবে? ফিরানীর সময় যদি গয়না না আনতো আমিও মেয়ে দেব না।" লতিফা ওদের কথা শুনে হেসে ফেল্‌ল, অথচ গত শনিবার সেও এই খেলা খেলেছে। আজ এ খেলায় তাহার মন মাতিয়া উঠিল না। নির্জন বারান্দায় বসে দুপুর বেলায় জাহেরা ও লতিফা তেতুল বিচি ফেলিতেছিল। সামনে লাইব্রেরীতে লতিফ ও আখতার গল্প করছে। হঠাৎ লতিফা বলে উঠ্‌ল, "জাহেরা! তোর নাকি বিয়ে?" জাহেরা বল্‌ল, "কেন, আপনারই তো বিয়ে ঐ আখতার ভাই সাহেবের সঙ্গে।" লতিফা হেসে উঠে বলল, "হাঁ, আর তো দুনিয়ায় মানুষ নেই কিনা?—তাই বিয়ে হতে হবে আখতার ভাই সাহেবের সঙ্গে। এমন বোকার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল; এসব যে বলে সেও বোকা।" তারপরে হেসে বল্‌ল, "তোকে বিয়ে করতে চাইলেও দিতাম না আমি।" ঘরের মধ্যে আখতার তখন স্থিরদৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রয়েছে। কথা কয়টি তাহার কানে বাজিয়া উঠিল। সে কি মনে করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

সহসা লতিফার সহিত চোখাচোখি। তাহার চক্ষে অনল জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে সে বলিতেছিল যাহাকে সে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহারই মুখে শোভা পায় বটে! সে প্রতিজ্ঞা করিল আর নারীর প্রেমের জন্য লালায়িত হইবে না। এক বৎসর পরে বিয়ের পরে লতিফা আখতারকে সালাম করে ফিরে আসার উদ্যোগ করিতেই আখতার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "শুনে যাও

লতা।" আখতার কি বলতে গেল; একবার ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠ্‌ল, পরক্ষণে বেশ সহজ স্বরে বল্‌ল, "তুমি সুখী হয়েছো, লতা!" এ কথার কি উত্তর দেবে সে? মাত্র তিনদিন বিয়ে হয়েছে, এরমধ্যে মানুষের কি পরিচয় পাওয়া যায়? তবুও তার মনে হলো সে সুখী। মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল, "হাঁ।" "আল্লাহ্‌তালা চিরদিন সুখে রাখুন" বলে আখতার চুপ করে রইল। লতিফা বল্‌ল, "যাব?" "যাবে বইকি, যাও, কিন্তু একটা কথা, আমি কি সত্য তোমার অযোগ্য ছিলাম? তোমার অন্তরের কুসুম কাননকে প্রস্ফুটিত করতে আমার কি কোনও দান নেই?" লতিফার কপালে মুক্তার মত ঘর্মবিন্দু ফুটে উঠ্‌ল। সংযত স্বরে সে বল্‌ল, "আপনি কোন মেয়েরই অযোগ্য নন ভাই সাহেব! আমি নিজের ভাই বলেই এমন কথা শোনাতে পেরেছি। জানেন তো ফুলটিকে ফুটিয়ে তুলতে আলো হাওয়া কত কিছুর দরকার। কিন্তু আলোর নয়, হাওয়ার নয়, যে গাছে ফোটে তারও নয়," বলে অগ্রসর হয়ে আর একবার সালাম করে ধীর পদক্ষেপে সে বেরিয়ে গেল, মুখে সাফল্য ও জয়ের দীপ্ত শ্রী।*

---

* মাসিক মোহাম্মদী, ২য় বর্ষ, পৌষ ১৩৩৫ পৃঃ ১৩২-৩৪।

নারীর ধর্ম্ম

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

"আমি বলছি রওশন—তোমায় পারতেই হবে।" "না—তা পারব না।" তবে বৃথাই এত শিক্ষা দীক্ষা,—সেই জংলী ভূত থাক্‌লেই পারতে।"

"যদি পর্দ্দার উচ্ছেদ করাই তোমার শিক্ষার আদর্শ হয়—তা'হলে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, তোমার এতগুলি পয়সা বৃথাই গেছে,—উপার্জ্জন করার শক্তি থাকলে শোধ করার চেষ্টা পেতুম।"

"রওশন! আমায় লজ্জা দিও না, ওদের স্ত্রীরা কত upto date। আমি গর্ব্ব করে বলেছি যে, তুমি ওদের চেয়েও বেশী শিক্ষিতা, এখন মিথ্যুক বলে আমায় সবাই টিটকারী দেবে। তাই কি চাও?—লক্ষ্মী রাণী আমার!—আর কোনদিন কিছু চাইব না। আমার এই কথাটি শোন।"

"আমার লজ্জা করে যে! যা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ তাই বা কেমন করে করব?" "আমার কথা কি তোমার ধর্ম্ম নয়? যাও—শেষবার বল্‌ছি, আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তা যদি সত্য হয়—পবিত্র হয়—তবে কাপড় ছেড়ে নাও।"

অনিচ্ছায় মন্থর গতিতে রওশন পোশাকের কামরায় গেল, বেছে বেছে একটা অনাড়ম্বর শুভ্র মসলিনের পোশাক ও একসেট মুক্তার অলঙ্কার পরে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লে "হায় প্রেম! তোমার কাছে আজ ধর্ম্মকে বলী দিতে হল।"

ড্রয়িংরুমে তার আবির্ভাবে আটজোড়া চোখ অপলক হয়ে গেল, যেন নিমেষ নেই, শুভ্র মুক্তাগুলোর নির্ম্মল হাসিতে ওকে দেখাচ্ছিল যেন শিশির মালা সজ্জিতা ভোরের গোলাপটি! সকলের পিছনে একটি যুবকের চোখ নত

হ'ল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা স্বরে বল্‌লে—"মূর্খ!" লতিফ সাহেব সশব্দে হেসে বল্‌লেন "কিহে, কারো কথা নেই যে? ইনিই হচ্ছেন আমার Better Half আর বুঝেছ এরা কেউ তোমার পরিচিত নন, সকলের কথাই তোমার সঙ্গে বলি কিনা? ঐ যে সকলের পিছনে ও হচ্ছে মাহবুব। নাও গৃহিণীর কর্তব্য কর, চা টা ঢেলে দাও।'

"মিসেস লতিফ! আপনি নাকি চমৎকার গাইতে পারেন, যদি অনুগ্রহ করে একটা শোনান।" রওশনের মাথাটা কোলের উপর ঝুঁকে পড়ল, মাহবুব তার পানে একবার চেয়ে লতিফের কাছে সরে এসে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—"পাগল হয়েছো? ওকে বের করে এনেছো কেন? ওরা হিন্দু, আমরা মুসলমান হয়ে কেন ওদের অনুকরণ করতে যাব? ধর্ম্মের সর্তের বাইরে যাওয়া সব সময় নিরাপদ নয়।" রওশন কথাগুলো শুনতে পেয়ে মুখের পানে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে। মৃদু হেসে লতিফ বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল "মোল্লাই ফৎওয়া ঝারতে এসেছ? তোমার অযাচিত উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" মাহবুব ক্রোধরক্তিমমুখে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

উৎসব বেশে রওশনকে বড় সুন্দর মানিয়েছিল। ফিকে সবুজ রংয়ের বহু মূল্যের রেশমের উপর সাচ্চা জরির কাজ করা শাড়ি ও ব্লাউজ। কণ্ঠে মুক্তামালা, কাঁধের উপর হীরকখচিত ব্রোচ, এগুলো এই উৎসব উপলক্ষেই তার স্বামী বিশেষ করে এনে দিয়েছিল।

অতিথিরা সবাই এসে পড়লেন। সকলেই হোম্‌রা চোম্‌রা সরকারী কর্মচারী। রওশন সকলকে অভ্যর্থনা করছিল। দায়ে পড়ে হাতও বাড়াতে হচ্ছিল। এক একবারের মিলিটারী ঝাকুনিতে তার হাত যেন ছিঁড়ে পড়ছিল। একজন বন্ধু লতিফের পিঠ চাপড়ে বললেন, "Lucky dog।" তোমার সৌভাগ্য অনেকেরই ঈর্ষার বিষয়—সত্যই সমবেত মহিলাদের মধ্যে রওশনের মত সুন্দরী একজনও ছিল না। সর্ব্বোপরি ওর বিপদমাখা সলজ্জ স্নিগ্ধ ভাবটুকুই ওকে আরো সুন্দর করে তুলেছিল। কথাটুকু তার কানে

যেতেই সে ভ্রূকুঞ্চিত করে অন্য দিকে চেয়ে রইল। আর একজন বলে উঠলেন "তোমাদের বড় অন্যায় এমন সৌন্দর্য পর্দা দিয়ে ঢেকে মানুষকে দর্শন সুখ হতে বঞ্চিত করে রেখেছ।" ছোট একটি কামরায় ছোট্ট গোল টেবিল ঘিরে সাত জন লোক বসেছিলেন, টেবিলের উপর ডিক্যান্টারে রক্তিম সুরা টলটল করছে। লতিফা সাতটা গ্লাস পূর্ণ করে সাতজনের হাতে দিলেন, প্রত্যেকে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে মুখে দিতে গিয়ে বললেন—,

"এই যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আজ দর্শন দানে আমাদের কৃতার্থ করেছেন তাঁর স্বাস্থ্য পান করি—ক্রমে মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে উঠল। এক মাতাল পানোচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল—"লতিফ! পিও পেয়ালা"। লতিফ বললে—"ও আমি খাইনে।" "বহুত আচ্ছা,— অরসিকেরও এমন বরাত! এমন সুন্দরীর জন্য আমি লাখ টাকা"—কথা শেষ না করতেই লতিফ ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

নির্জনে একজন বন্ধু বুঝিয়ে বললেন, "অত চটোনা হে! অত বড় একজন কমিশনার, কত সুন্দরী ও সুন্দরী বল্লভেরা ওর মুখের একটু কথার জন্য লালায়িত। ওটা নিছক মাতলামি বই আর কিছু নয়। তা ছাড়া গাঢ় বন্ধুত্বের স্থলে ওরকম পরিহাসও চলে। কিছু মনে করে না, তুমিও ভেবোনা।" "আপনার কি অসুখ করেছে? এক গ্লাস সরবৎ দিতে বলব?— একটু ঠাণ্ডা পানি?—না হয়। এই সোফাটায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।" "ধন্যবাদ—না কিছুরই আবশ্যক নেই?" "ওকি মাহবুব সাহেব! আপনি যে এঁকে দখল করে রইলেন! নাঃ—আজ একটি গান না শুনে কিছুতেই ছাড়্‌ছিনে," "এঁরা শুনতে চান, গাও রওশন, না গাইলে বড্ড অভদ্রতা হবে," বিনা আপত্তিতে শিথিল চরণে রওশন পিয়ানোর নিকটে গেল, ক্লান্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল "ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।"

দু' বৎসর পরের কথা, আজ কাল আর রওশনের অতটা সংকোচ নেই। মাসের মধ্যে একবার ডিনার পার্টি হয়, তাতে সে বেশ সুচারুরূপেই গেয়ে, বাজিয়ে ও গল্প করে সকলের মনোরঞ্জন করতে পারে। সকলেই তাকে নারী সমাজের আদর্শ বলে স্বীকার করে। করে না শুধু

তার নিজের মন, সর্বদাই সে মনে করে সে নারীর আদর্শ বিধাতা। তার এই দেহমন শুধু স্বামীর নয়, বহুজনের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত। এই কি নারীর ধর্ম? কোলে এক বৎসরের ছোট্ট জাহাঁগীর—ওর কচি মুখের মিষ্টি মা ডাকে, স্বামীর আদরে কখন কখন মন শান্ত হতো। কিন্তু শান্তি ক্ষণিকের, দিনের পর দিন পুরুষের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি ওকে বিদ্রোহী করে তুলছিল। মাঝে মাঝে মাহবুবের সম্ভ্রমপূর্ণ সহানুভূতি একটু একটু সান্ত্বনা দিত। কিন্তু সে পারত পক্ষে তার সামনে আসত না: আর এক উৎসবময়ী রজনী, কমিশনারের বাড়ী সমারোহে পূর্ণ, আলোকে উজ্জ্বল। কমিশনার গৃহিণী বহুমূল্য সিল্কের শাড়ী ও হীরক অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করে বেড়াচ্ছিলেন। শুভ্রকায়া ও সুচেহারা হ'লেও ইনি স্থূলতার আধিক্যবশতঃ মোটেই শ্রী নন, বরং বিশ্রীরই কাছাকাছি। সবার শেষে এল রওশন, তার মুখ মলিন, কিন্তু স্বামীর সাগ্রহ আদেশে সেও সুসজ্জিতা। গৃহকর্ত্রী তাকে টেনে নিয়ে ঘরের মাঝখানে রেখে বললেন, "ইনি হচ্ছেন My Queen." "সত্যিই সেটা মে মাস, রওশন চাপা সুরে বল্‌লে, "আপনার উর্ব্বর কল্পনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" এ মজলিশে অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী। খাওয়া দাওয়ার পর একজন ইংরেজ যুবক বল্‌লেন, "শুকনো গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চাই। মহিলাগণ ইচ্ছা করলে অন্তরালে গিয়ে কেশের পারিপাট্য সাধন ও পাউডার লেপন করে গণ্ড রক্তিম করে নিতে পারেন।" সবাই হেসে উঠল। মহিলারা সবাই উঠে গিয়ে অন্য জায়গায় জটলা করতে লাগলেন, রওশনের এসব কিছুই ভাল লাগছিল না। ছেলেটিকে ফেলে এসেছে, তার কথা মনে পড়েছে। চাকর দাসীদের হাতে খাওয়াটা হবে কিনা, কে জানে? এসব ভাবতে ভাবতে সে বারান্দায় পায়চারী কচ্ছিল। পাশে একটা খালি কামরা ছিল। মন চায় একটু নিরালা আশ্রয়। সে কামরাটায় ঢুকে পড়ল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, দুনিয়া যেন আবীরের রঙে রঙীন। নদীপারের প্রান্তরে নিঃশব্দে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো,—সহসা খুট করে

কে ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা জ্বালিয়ে দিল, তারপরেই অসংযত উচ্ছল কণ্ঠ শোনা গেল—"বাঃ বাঃ মেঘ না চাইতেই জল"—চম্‌কে চেয়ে রওশন দেখলে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কমিশনার সাহেব, পা দুটি টলছে। চোখ লাল। এই অসংযত অপ্রকৃতিস্থকে দেখে সে শিউরে উঠল, লতিফের কথা মনে হলো। কিন্তু কোথায় তিনি? তিনিও হয়ত এই অবস্থায় কোথায়ও পড়ে রয়েছেন; আজ কাল তো আর এসবের উপর ঘৃণা নেই। মুহূর্ত মধ্যে সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়ে বলে উঠল—"সরে দাঁড়ান," কমিশানর কিন্তু বে-পরোয়া অপূর্ব ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, "তোমার রূপের দ্বারে অতিথি, সুন্দরী। নিরাশ করো না মোরে।" ক্ষোভে ক্রোধে রওশনের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। সে অগ্রসর হয়ে কপাট ধরতেই উচ্ছৃঙ্খল একহাতে তার হাত চেপে ধরে অন্য হাতে দরওয়াজা বন্ধ করতে গেল। দূরে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে এদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিল সে দৌড়ে এসে সজোরে দরওয়াজা ধাক্কা দিয়ে খুলতেই রওশন একদিকে সরে দাঁড়াল। আগন্তুক সজোরে মাতালের উপর দু' তিন ঘুসি লাগাতেই তার নেশা ছুটে গেল, দাঁত ভেঙ্গে রক্ত ঝরতে লাগল। সে পকেট হতে রুমাল বের করে মুখের উপর চেপে ধরে বল্‌ল, "আচ্ছা, পাবে এর প্রতিফল—আগন্তুক মাহবুব।" সে গর্জ্জন করে উঠল, "রাস্কেল মাতলামো করবার আর জায়গা পাওনি?" কমিশনার একবার কটমট দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যেতেই রওশনের দিকে চেয়ে বললে "চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি। লতিফটা গেল কোথায়?"

নীরবে তার অনুসরণ করে বারান্দায় পা দিয়েই অস্ফুট শব্দ করে রওশন পড়ে গেল। বিস্মিত হয়ে মাহবুব মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। দেখ্‌ল—রওশন সম্পূর্ণরূপে অচৈতন্য। এদিকটা কি নীরব নির্জ্জন, একটা লোকও দেখা যায় না। কমিশনার সাহেব মুখের উপর রুমালটা চেপে ধরেই সেই পাশ কক্ষে উপস্থিত হলেন। সবাই উঠে গেছে। শুধু লতিফ বসে একখানা নভেল পড়ছে, উঁকি দিয়ে দেখলে সেখানা "হাউস"। সে তার সামনে গিয়ে

মুখ হতে রুমালখানা সরিয়ে ফেললো। রক্ত জমাট হয়ে মুখখানা অতি বীভৎস দেখাচ্ছিল। সে দৃশ্য দেখে লতিফ চমকে বললে—"একি! এমন হলো কি করে?"—একটা শ্লেষের হাসি হেসে সে উত্তর দিল, "তোমার স্ত্রী প্রণয়ী অর্থাৎ মাহবুব সাহেবের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে।" লাফিয়ে উঠে তার ঘাড় চেপে ধরে লতিফ বললে—"চুপ রও মাতাল।" বিকৃত কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "ছাড়, ছাড় লাগে যে। প্রমাণ আছে যদি চাওতো চলো।"

ছেড়ে দিতেই সে চলতে আরম্ভ করল, লতিফও তার অনুসরণ করল, তার অন্তরে তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে, বারান্দায় পা দিয়ে সে বললে,—"তাদের প্রেমালাপে বাধা দিয়েছিলাম, এই আমার অপরাধ।"

লতিফের আর কথা বলার শক্তি ছিল না। একজন মহিলা লতিফকে দেখে বলে উঠলেন "এই যে আপনার মিসেস্ লতিফ কোথায়? চারটার পর হতে আর দেখছিনে।" ঝড় আরও প্রবল হয়ে উঠল। একটা নির্জন কামরায় মস্ত একটা সোফার উপর অর্দ্ধ শায়িত রওশন, পিছনে মাহবুব দাঁড়িয়ে। লতিফকে নিয়ে কমিশনার ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, "এই দেখ।"

সেই কৌতূহলী মহিলাটিও তাদের পেছনে এসেছিলেন, তা কেউ বুঝতে পারেনি; উঁকি দিয়ে দৃশ্যটি দেখেই তিনি চম্পট দিলেন এবং এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সদল বলে পুনরায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন কমিশনার সাহেব বললেন, "আমার উপর চটে মটে দিলেন ঘুসি লাগিয়ে, কিন্তু কলঙ্ক কি চাপা থাকে? বন্ধুর এমন কাণ্ড! উনিই না হয় সরলা-অবলা, তাওবলি এমন স্ত্রীকে কিন্তু ত্যাগ করা উচিত।" মাহবুবের তার কথার উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ হ'লে, সে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল "শোন লতিফ ওর কথাটা" বিদ্রূপের হাসি হেসে কমিশনার সাহেব বললে "হ্যাগো, এখন তো সাফাই গাইবেই। রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায়, পথিক ও চোরে হাতাহাতি। এ বলে এ চোর, 'ও বলে সে চোর' সেই কাণ্ড আর কি?" মহিলামণ্ডলীর মধ্যে হাসির গুঞ্জন শোনা গেল, পাগলের মত হ'য়ে রওশনের হাত চেপে

ধরে লতিফ বলে উঠল "এ সত্য রওশন ? এও শুনতে হ'ল ? তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল।" বাত্যাহত। লতার মত কেঁপে উঠে রওশন আবার মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়লো। এক ঝাকুনি দিয়ে লতিফ বললে "ন্যাকামী ছাড়।" তার বিকট মুখের পানে চেয়ে মাহবুবের মন চূর্ণ হয়ে গেল, হায় দুর্ভাগা নারী ! কাল যে তোমার মুখ লুকাবার ঠাঁই এ দুনিয়াতে থাকবেনা। কমিশনার সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে বল্‌লেন "ও রকম ঢং আমি— ।" এইবার মাহবুব ক্ষিপ্তের ন্যায় তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে ছোট্ট শিশুটির ন্যায় রওশনকে তুলে ড্রয়িংরুমে এনে পাখা খুলে দিয়ে চোখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রওশন একটু সুস্থ হলো। মাহবুব চেয়ে দেখে লতিফ নেই। কোথায় সে ? একটু পরে লতিফ এগিয়ে এসে তার হাতে দুখানা কাগজ দিয়ে বললে "এই নাও,—তোমাকে দিলেই চলবে বোধ হয়। সেগুলি না দেখেই মাহবুব বললে "তোমার ঘরে চল, সব ঘটনা বলছি।" 'কিছু শুনতে চাইনে" বলে লতিফ বেরিয়ে গেল। তখনই মোটরে ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। স্তম্ভিত মাহবুব কাগজগুলি খুলে দেখে একখানা তালাক নামা ও একখানা মোহরানা বাবদ বিশ হাজার টাকার চেক, সেগুলি পকেটে রেখে সে রওশনকে বললে, "চলুন।" রওশন উঠে দাঁড়ালো। তার পা কাঁপছিল, তবু সে যেয়ে গাড়ীতে উঠল। গাড়ী চলতেই রওশন জিজ্ঞাসা করল, "ও দুখানা কি ?" বিনা বাক্যে মাহবুব সেগুলি তার হাতে দিয়ে দিল। রাস্তার আলোকে একটু দেখে নিয়ে রওশন জিজ্ঞাসা করল, "তা এখন যাচ্ছেন কোথায় ?" জড়িত স্বরে উত্তর হল, "আপনাদের বাংলায় চলুন না একবার ?" "ছি লজ্জা করে না এ কথা বলতে ?" এসত্বেও আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করতে যাচ্ছেন ? এতই কি কাপুরুষ আপনি ?" "কি করব ? আমার ঘরে তো মেয়ে মানুষ নেই, তা ছাড়া আমি বদলী হয়ে কালই খুলনা যাচ্ছি তা জানেন তো ?" "কাল কেন এখনই চলুন, দেখুন, আমাকে বিয়ে করতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?" "না"।

"তবে এই মুহূর্ত্ত হতে আমার সম্মান রক্ষার ভার আপনাকে দিলুম।" অস্ফুট কণ্ঠে মাহবুব বললে, "আপনার ছেলে।" রওশন উত্তেজিত কণ্ঠে বললে "কাপুরুষ,—বিনা দোষে বিনা বিচারে যে আমাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে,—সে ছেলে দিবে মনে করেছেন?—না, ও তারই থাক।"

ষ্টেশনে পৌঁছে তারা দেখলে ট্রেন আসার আরও আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। ওয়েটিং রুমে বসে রওশন বললে "আমি একখানা চিঠি লিখছি, লিখব?" "লিখুন"।

কতক্ষণ পর রওশন চিঠি মাহবুবের হাতে দিলে সন্ধ্যার ঘটনাটা অদ্যোপান্ত বর্ণনার পর লেখা আছে, তোমাকে এভাবে চিঠিপত্র লেখার অধিকার জগতের কোন ধর্ম্ম বা নীতি অনুসারে আমার নেই; থাকলেও ঘৃণা বোধ হত। কিন্তু শুধু এইটুক বুঝাতে চাই যে আমি বিশ্বাস হন্ত্রী নই, একান্ত তোমারই ছিলুম—তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে দেশের লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে ছিলে। তাই ঐ মাতালটার হাতে পড়ে তোমার কথা মনে কোরেও বিশেষ জোর পাইনি। মানষিক শক্তি থাকলে হয়ত বেরিয়ে পড়তে পারতুম, না পারলে চিৎকার করাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তোমার দৌর্ব্বল্য আমার সকল শক্তি হরণ করেছিল। যদি মাহবুব সাহেব সময় মত সেখানে উপস্থিত না হতেন, তাহলে কি হত তা আমি এখনও বুঝাতে পারছিনে।"

"ছেলে ফেলেই চল্লুম। যদি দেওয়ার ইচ্ছা হয় লিখলে আনাব, না দিলেও বলবার কিছু নেই। তবে একটা কথা তোমাকে আমার বলবার আছে। নারীর নারীত্ব সবার উপরে—সে জন্য বলি, নারীকে অবরোধে বন্দিনী করে হত্যা করো, তাও মন্দের ভাল, পশুবলের কাছে লজ্জিত হতে দিও না। তুমি যে আমায় ভাল না বাসতে তা নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌তালাকে সাক্ষ্য করে আমার ধর্ম্ম রক্ষার ভার নিয়েছিলে অথচ তা রক্ষার শক্তি তোমার নেই। যদি তুমি আমায় ত্যাগ নাও করতে, তবু শুধু আমি এই জন্যই তোমাকে ছেড়ে যেতুম।"

ধর্ম্মের জন্য ধার্ম্মিকা নারী হাসিমুখে সব ত্যাগ করতে পারে। স্বামী, সংসার, পুত্র কন্যা, সব,—যে ধর্ম্মের জন্যে আমার এই আত্ম বিসর্জ্জন, সেই ধর্ম্মই আমার শিশুকে রক্ষা করবে। তোমরা আমাদের এমন করে গড়ে তুলেছ যে, আত্ম-রক্ষা ও আত্ম-প্রতিপালনের শক্তিও আমাদের নেই; তাই বাধ্য হয়ে মাহবুবকেই আমার ভার দিতে হ'ল। বিশ্বাস হয়তো নাও করতে পার—বা আমার কারো প্রতি এতটুকু মোহও কোন দিন ছিল না।"

বহুদিন পরের কথা;—সেই রাত্রি হতেই মাহবুবের বুকে কেমন ব্যথা হয়েছিল, কিছু দিন পরে তা থাইসিসে দাঁড়াল। তখন চাকুরী ত্যাগ করে সে দেশে চলে গেল। "রওশন! আর যে এ যাতনা সহ্য হয় না, আচ্ছা, এই তো মোটে আটত্রিশ বৎসর বয়স, এর মধ্যে এমন কি পাপ করেছি যারজন্য এই শাস্তি? আচ্ছা লতিফের প্রতি কি আমি অবিচার করেছি?''

"এমন কথা মুখেও এন না।"

"তবে? তুমি? তোমার কাছে কি কোন অপরাধ করেছি?" "না অমন করে বলোনা তুমি, বরং আমিই তোমার জীবনটাকে নিজের অভিসপ্ত জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছি। "আচ্ছা বলতো আমার প্রতি কি তোমার কৃতজ্ঞতা না ভালবাসাও আছে?"

"সব—সব—শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা সবইতো—দিয়াছি।" "না না সব নয় সর্ব্বস্বের উপযুক্ত আমি নই। শুধু ভালবাসা—ভালবাসা আমি চেয়েছি।" রওশনের দু চক্ষু জলে ভরে এল। অনেকক্ষণ পরে মাহবুব বললে, "লতিফের কাছে একটা তার করে দাও আমি তার ক্ষমা চাই।'' তার গেল—"মাহবুব মৃত্যু শয্যায়, তাকে ক্ষমা কর? "রওশন"। উত্তর এল—"সর্বান্তকরণে ক্ষমা করেছি, ক্ষমা প্রার্থী।''

"লতিফ"

যখন উত্তর এল, তখন মাহবুব প্রলাপ বকছে—"জোলেখা,—জোলেখা—বড় ভালবাসি, ভালবাসি, আর উপেক্ষা নয় শিগ্‌গীরই বিয়ে হবে,—

"রওশন, আঃ! বড় দুর্ভাগিনী, ওকেই ভালবাসি—না তোমায় চাইনে। তোমায় চাইনে, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জল, ওর যে চতুর্দিক অন্ধকার।"

রওশনের দু' চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ছুটল। নিজের সুখ দুঃখ কিছু নেই, আর কেউ নেই তারই,—আত্ম সংযম করে মুখের উপর ঝুকে পড়ে রওশন তারের এই মর্ম্মটা বুঝিয়ে দিতেই মাহবুবের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। "ক্ষমা চেয়েছে। তবে নিজের ভুলটা বুঝেছে, ওঃ কি ভুল!" রওশন রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "আমাকে ক্ষমা কর প্রিয়, আমি যে তোমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিলাম।" "না, না ক্ষমা নয় রওশন—শুধু—ওঃ কত আলো; আলো রওশন, আল্লাহ্—।"

রওশন যখন মুখ তুললে তখন সব শেষ হয়ে গেছে। সুখের শান্তির একটা স্নিগ্ধ হাসি। রওশন উঠে একখানা সাদা চাদর নিয়ে ধীরভাবে তার সর্ব অঙ্গ ঢেকে দিতে দিতে বললে "ওকে গ্রহণ করো প্রভু? জীবনে ও সৎ লোক ছিল, মরতে বিশ্বাসীর মতই মরেছে, এবার যেন তোমায় পায়।" *

---

* মাসিক মোহাম্মদী ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, পৃঃ ১২০-২৩

রূপহীনা

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

কলিকাতা মহানগরীর একপ্রান্তে সুসজ্জিত আরামবাগ। শোনা যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অতীত যুগের কোন এক বাদশাহের অধস্তন একাদশ বা দ্বাদশ পুরুষের দাবী করেন। হয়ত তাই, কিন্তু ভালো জিনিষ কাজে লাগার পর অবশিষ্ট যেমন অ-কেজোর চেয়েও বেশী কিছু হয় এও সেই রকম। অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই জন গুণধরই মদ, জুয়া ও বাইজীর চরণে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া খোলার ঘরে বাসা বাঁধিয়াছেন। তবু চাল চলনে বড় কম যান না, যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহারা সমস্ত দিন চালের ছায়ায় বসিয়া মাটিয়া গুড়্গুড়িতে তামাক টানেন ও সম-অবস্থাপন্নের সহিত ফরক্কাবাদী বাঈজী ও বত্রিশ টাকা ভরির তামাকের বর্ণনা করেন, সে তামাকের কাছে কোথায় লাগে আতরের খোশবু?—পরক্ষণেই হয়ত নাতনীকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলিলে সে ছিন্ন মলিন আঁচল ও তৈলহীন রুক্ষ চুল দুলাইয়া বলে, "এক পয়সার তামাকে আট চিলিমের বেশীতো হয় না দাদা?" বৃদ্ধ কিছুক্ষণ গুম হইয়া থাকে।

মাসের প্রথমে সরকারী তলব আসে পঞ্চমুদ্রা; বিজিতের প্রতি বিজেতার অনুগ্রহ। দুই একবেলা ছেলে বুড়ো সকলেই কলরব করিয়া পোলাও, কোর্মা খায়, তারপর যুবকেরা তেড়ি কাটিয়া উগ্রগন্ধি বিড়ি মুখে দিয়া, রাত্রে ফিরে দ্বিগুণ উগ্রগন্ধ ও চতুর্গুণ কড়া মেজাজ লইয়া। খুব বে-এখতেয়ার হইয়া না পড়িলে পত্নীর কষ্টার্জ্জিত দুই চারি আনা পয়সা লইয়া আবার বাহির হয়। তরুণী-বধূ নৈশ-আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদে ও কতগুলি ঠোঙ্গা বিক্রয় করিয়া পয়সাগুলি জমাইয়াছিল তাহাই ভাবে। শিশু ও বৃদ্ধদের সারামাসের অন্ন-সংস্থান এই নারীরাই করে, তারা কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ার করে, কোর্ত্তা

সেলাই করে, কসিদার কাজ করে, পাইকার আসিয়া নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া নেয়, এছাড়া উপায় কি ? ছেলেরাও তো কোন কাজে লাগে না, সমস্ত দিন পথে পথে ঘুড়ি উড়ায়, বন্ধু-বান্ধবদের পয়সায় চা খায়, সুযোগ মত পকেট মারে, নেহায়েৎ না জুটিলে ঘরে আসিয়া উৎপীড়ন করে। আরও কত উপসর্গ আছে, নগরের কোলাহল না থাকিলেও "কাপড়া ওয়ালা", "মালাই বরফ", "বেলফুল", 'গরম চা", "চুড়ি চাই", "হরেক রকম খেলনা" ইত্যাদির তো অভাব নাই। অভাব, উৎপীড়ন ও "লাঞ্ছনা-জর্জ্জরিত তরুণ" মনগুলিও কাঁচের চুড়ি, ফুলের মালা ও এক পয়সার রঙে রঙিন কাপড় পড়িয়া কাহিনীর মত শোনা সেই অতীতের হীরা-পান্নার গহনা ও মনি-মুক্তাখচিত পোষাকের অভাব মিটায়, ভাঙ্গা ঘরে সহস্র দীপাবলী-উজ্জ্বলিত রঙ্গমহলের স্মৃতি ফিরাইয়া আনে।

এই মরণোন্মুখ বস্তিরই মাঝখানে আরামবাগ। ঠিক যেন পড়ো-বাগানের অযত্ন-বর্দ্ধিত রৌদ্রদগ্ধ আগাছার মধ্যে ফুটন্ত গোলাপ। ইহার বর্তমান মালিক পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা ছিলেন খামখেয়ালী, মা'টি ছিলেন ইরানী, তাই এঁর মাথারও ঠিক ছিল না, রাগেরও সীমা ছিল না, অথচ বংশানুক্রমিক অন্য কোন দোষ তাহার মধ্যে মোটেই দেখা যাইত না, সুতরাং চতুর্দ্দিকের সমান ঘরের কুমারী-কন্যার জননীরা যে পরিমাণে তাহাকে জামাতারূপে কামনা করিত তার চেয়ে অনেক বেশী করিত নিন্দা, কেননা সে কোন জালেই ধরা দিতে চাহিত না। বিবাহ সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। সে বলিত "বিয়ে করা মানে একটি খেয়ালী জীবের অধীনতা স্বীকার করা, সে হাসাতে, কাঁদাতে বা নাচাতে সবই পারে, কাজকি অমন গোলাম হয়ে ?"

মা, বোন না থাকলেও অন্দর মহলে মানুষের অভাব নাই। দূর সম্পর্কীয়া এক চাচি-আম্মা চারি কন্যারত্ন সহ বিরাজ করিতেছেন। বড়টি বিশ বছরের, অন্য তিনটি আঠার, ষোল ও চৌদ্দ বছরের, নাম মাহবুব জাহাঁ, মাহতাব

জাদী, হাসমৎ আরা ও মমতাজ আরা, বড় তিনটি প্রখরা ও সুন্দরী। ছোটটি শিশির ভেজা কচি ঘাসের মত করুণ লাবণ্যমাখা ও শ্যামা, এক বাঙ্গালী ঝিলাই তাকে মানুষ করিয়াছে তারই দেওয়া ডাকনাম "নীলা"।

যাকে এরা পর্দা ও প্রাচীরের আড়ালে বুঝিবা চন্দ্র সূর্য্যেও দেখে না। বড় তিন বোন নয়টার আগে উঠে না, ওঠা বোধ হয় শাহজাদীদের নিয়মও নয়। বিছানায় বসিয়াই চা পান করা চলে, তারপর মুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া বারটায় নাশতা-পর্ব ও চারিটায় খানার আয়োজন হয়। মমতাজের এতটা সহিত না। সে ভোরেই উঠিয়া পড়িত, পুরাতন মহলের সম্মুখ ভাগটা নূতন ধরণে সংস্কার করিলেও পেছনে সেই সাবেক প্রাচীর লতার মত। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া মমতাজ ছায়াটির মত সেখানে ঘুরিত। ভাঙ্গা ফোয়ারা, জীর্ণ হাম্মাম, পুরাতন প্রকোষ্ঠ পূর্বপুরুষদের স্মৃতি-জড়িত—এসব স্থানে কি যেন অজানা রহস্য সুপ্ত রহিয়াছে। পূর্বে যাহারা এইখানে বাস করিত তাহাদেরও সুখ দুঃখ ছিল, হাসি গানে রূপে গন্ধে সুরে ঝংকারে যে স্থান মুখরিত ছিল, আজ তা গোরস্থানের মত নীরব,—চাহিয়া চাহিয়া মমতাজের চোখে পলক পড়িত না। একধারে ছোট্ট একটু বাগান ছিল তার, বাহির মহলের বিচিত্র সুন্দর প্রজাপতির মত বাগানের সংগে তার তুলনাই হয় না। কুমারীর অম্লান হিয়ার মতই যুঁই, বেলা, রজনীগন্ধা, হাস্নাহেনা ও কামিনী বাগান আলো করিয়া ফুটিত। মাঝে মাঝে নব অনুরাগের মত রঙিন বসোরা গোলাপও ফুটিত। সকাল বিকাল মমতাজের অনেকটা সময় এই বাগানের পরিচর্যায়ই কাটিত। বোনেরা সুন্দর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া বলিত, "মালিকে ডেকে বললে অমন কত বাগান হয়! তা নয় নিজের হাতে করা! করুক, যেমন রূপের বাহার; কার ঘরে পড়বে কে জানে? কাজ করেই তো খেতে হবে।"

তাদের মা'র মনে আশা ছিল জাহাঁগীর যদি তাঁর কোন মেয়েকে বিবাহ করে তবে তিনি জীবনের বাকী দিন কয়টা সুখ শান্তিতে কাটাইয়া দিতেন,

কিন্তু বেয়াড়া ছেলে তাঁহার পরধরি নাম যে ঘুচাইবে সেরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া তো বোধ হয় না। সে নিজে বা তাহার কোন দাসদাসী পরের ঘর বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে না দিলেও ঈর্ষান্বিত আত্মীয় কুটুম্বেরা নানা কথাই বলিত। একদিন তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বৈকালের নাশতার সময় একথা সে কথার পর বলিলেন, "বাবা! তোমার বোনেরা সেয়ানা হয়েছে, ওদের বিয়ের তো একটু চেষ্টা করতে হয়, বড় তিনটির জন্য দু' এক জায়গা হতে কথাও এসেছে। নীলা দেখতে তেমন ভাল নয়, এত ছাপাই তবু কি করে যে লোকে জানতে পারে আল্লাহ্ই জানেন। এক পয়গাম পাঠিয়েছিল বুড়ো বাহাদুর শা। আমি বলি কি বয়স পঞ্চাশ হ'লে কি হয়, টাকা পয়সা আছে, বেশ সুখে থাকবে, দিলেও মন্দ হয় না,—তুমি কি বল? ওকে বাদ দিলে আমার মেয়েরা রূপে গুণে কারো চেয়ে কম নয়। তুমি যদি কোন একজনকে বিয়ে কর সে তো সবদিক দিয়েই ভাল হয়।"

জাহাঁগীর নীরবে শুনিল, খাওয়ার পর হাত ধুইতে ধুইতে বলিল—"মাফ করবেন চাচী-আম্মা, আমি বিয়ে করব না। তবে ওদের যাতে ভাল বিয়ে হয় সে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।"

কৌতুহলক্রান্তা চাকরানীদের কৃপায় ব্যাপারটা মেয়েদের কাছেও গোপন রহিল না, রূপসী কুমারী তিনটি প্রত্যেকেই এ বাড়ীর ভবিষ্যৎ গৃহিনী হওয়ার আশা রাখিত। তাই তাহারা এতবড় অপমানে জাহাঁগীরের মুণ্ডু চিবাইয়া খাওয়ার উদ্যোগ করিল। নীরবে রহিল শুধু রূপহীনা মমতাজ।

মায়ের মত স্নেহময়ী চাচী-আম্মাকে আশাভঙ্গের বেদনা দিয়া জাহাঁগীরের মনেও শান্তি ছিল না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে খোলা ছাদে পায়চারি করিতে করিতে ভাবিল কি করা কর্তব্য, তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃতি হওয়া যায় কি? জীবনটা এমন ছন্নছাড়ার মতই কি সে কাটাইবে? একটি নারীকে যদি সুখে সুখী, ব্যথায় দরদীরূপে পাওয়া যায় তো মন্দ কি? কিন্তু এই শাহ্জাদীদের মধ্যে কি তেমন কেহ আছে? বিড়ালের গায়ে

কেরোসিন তেল মাখিয়া আগুন ধরাইয়া যাহারা তামাসা দেখে,—না কিছুতেই নয়!"

দ্বিপ্রহরে এক কাপড়ওয়ালী নানা রকমের কাপড় লইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে রঙের পশরা সাজাইয়া সে বসিল, সকলেই কাপড় বাছিতেছে। মাহবুব জাহাঁ একখানি রূপালি বুটিতোলা গাঢ় নীল রংয়ের ঢাকাই শাড়ী গায়ের উপর ফেলিয়া দেখিতেছিল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণে কেমন মানাইয়াছিল। কাপড়ওয়ালী বলিল, "ওখানা নিতেই হবে বেগম সাহেবা, দাম কাপড়ের তুলনায় কিছুই নয়, মোটে ত্রিশ টাকা, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

একটু হাসিয়া মাহবুব জাহাঁ কাপড়খানা তুলিয়া লইল, মমতাজ একটু দূরে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল, সকলের কাপড় লওয়া হইলে মা ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কাপড় নিলে না যে নীলা?"

সে ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিল। বোনেরা কৌতুকহাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া বলিল, "ও নেবে কেন আম্মা? দু'দিন পরে রাজা বাদশার সংগে বিয়ে হবে, দশ বিশ হাজার টাকার এক এক শাড়ী পড়বে, ওর কি এসব চোখে লাগে? বাহাদুর শা-ই রাজার চেয়ে কম কি? টাকা আছে।"

মমতাজ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "লজ্জা থাকলে আর একথা বলতে না, পরের টাকায় শাড়ী পড়তে খুব আরাম, না? এইতো সেদিন অত টাকার কাপড় নেওয়া হলো, কেন আমরা ওর টাকা খরচ করব?"

সকলেই কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। একটু পরে তীক্ষ্ণকণ্ঠ আরও শানাইয়া মাহবুব জাহাঁ বলিল, "এত দরদ কেনগো? তোমার স্বামীর পয়সা নাকি? তবু যদি সকল গোষ্ঠীর কপালে কালি না দিত।" ব্যথা ভরা সুরে মমতাজ বলিল, "স্বামীর পয়সা হলে আপত্তি ছিল না—গোষ্ঠীর কপালে লাথি দিয়েছে বলেই তো ওর পয়সা খরচ করতে ঘৃণা হয়, শক্তি থাকলে এ বাড়ীর ভাত খাওয়াও ছাড়তুম।"

মাহবুব জাহাঁ উত্তর দিল "ঠিক তাই, যে পেত্নীর ছুরত. এ বাড়ীর ভাত খেতে হবে না, ঐ তো টাকাওয়ালা বুড়ো পয়গাম পাঠিয়েছে, খুব খেতে পরতে পারবি।"—এবার মমতাজের চোখে শ্রাবনের ধারা নামিল।

একটু আগে চাচী আম্মার খোঁজে আসিয়া সেখানে মেয়েদের উপস্থিতিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া জাহাঁগীর ইতস্ততঃ করিতেছিল. সমস্ত কথাই সে শুনিল। মাহাবুব জাহাঁ চুপ করিলে অগ্রসর হইয়া দেখিল ছ'টি কাজল চোখে সন্ধ্যার আঁধার ও বর্ষার বারি একই সংগে নামিয়া আসিয়াছে, কি ব্যথা ও লজ্জা সেই চোখে! ওই লজ্জা মুছাইতে, ওই ব্যথা ঘুচাইতে কি সে পারে না? জাহাঁগীর ভুনিয়া ভুলিল, একটু আগে তাকে যে ঘৃণা করে বলিয়াছে তাও ভুলিল। যে কোমল তেজস্বিতা ও সতেজ তরুণ মন সে তার মানসীর মাঝে কল্পনা করিয়াছে এইতো সে। কোনদিকে না চাহিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চাচী আম্মাকে সালাম করিয়া বলিল, "আম্মা! আপনি যদি খুশী হয়ে দেন তবে মমতাজকে আমি চাই।"

এই সংবাদ অন্দর-মহলে যখন গিয়া পৌঁছিল. তখন সেই পুরাণো বাড়ীর সুন্দরী কিশোরীদের মধ্যে এক নিরুদ্ধ রাগ ও ঈর্ষার প্রবাহ বহিয়া গেল। তাহারা সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, আর ভাবিল, সে কাল আর নাই রূপের মর্য্যাদা দিবে কে?*

---

* মাসিক মোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, পৃঃ ১২৯-৩১।

গল্প হলেও সত্যি

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী

দীর্ঘ তিনটি মাস ছুটি উপভোগের পর একদিন সত্যি সত্যি ফিরে এলাম আমাদের হোষ্টেলে। কিন্তু হোষ্টেলে পদার্পণ করামাত্র যে অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি বেদনাদায়ক। এ ধরণের কারবালা কাণ্ডের স্বরূপ খানিকটা অনুমান করেছিলাম বটে তবে কল্পনাকে ছাড়িয়ে বাস্তব যে এতদুর গড়িয়ে যাবে তা ভাবতে পারিনি কোন দিন।

কলকাতার সাম্প্রদায়িক গোলযোগই ছিল আমাদের দীর্ঘ অবসর গ্রহণের একমাত্র কারণ। আর তাছাড়া আমাদের এই প্রাসাদোপম ত্রিতল অট্টালিকা সবাকার পক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় দুঃস্থ, নিপীড়িত ও মৃতপ্রায় আশ্রয় প্রার্থীদের বাসস্থানের জন্য। আমাদের পৌঁছাবার কিছুদিন পূর্ব্বেই আশ্রয় প্রার্থীদের অন্যত্র সরানো হয়েছিল; কিন্তু অবস্থিতির যে নগ্নরূপ তারা রেখে গিয়েছিল তা যেমন হৃদয়বিদারক তেমনি বীভৎস। মফঃস্বলের ছোট্ট শহরে বসে খবরের কাগজের অতিরঞ্জিত কাহিনীর বর্ণনায় ও যে মন ছিল অচঞ্চল, সত্যিকার ঘটনার সামান্য ছাপ দর্শনেই তাকে করে তুললো বিচলিত ও চঞ্চল। যাহা হউক শিগ্‌গীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে সচেষ্ট হলাম। চতুর্দিকে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো ও ফিনাইল দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দিয়ে একটা বোট্‌কা গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল। প্রত্যেকটি রুমের খাটের ষ্ট্যাণ্ড, গদি টেবিল, চেয়ার ভগ্ন অবস্থায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ছিল। সেগুলিকে কোন রকমে জোড়া তালি দিয়ে আমাদের থাকার আপাততঃ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। খেলার মাঠ ভর্তি বড় বড় চুলীগুলি

তখনো হাঁ করে তাকিয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। তাদের সে বিরাট গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি সেগুলো বুজিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করা হলো।

এই গোলমালে খুব অল্প সংখ্যক মেয়েই হোষ্টেলে ফিরে আস্তে অনুমতি পেয়েছে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে। "পড়াশুনার চেয়ে বেঁচে থাকার মূল্য অনেক বেশী",—বাঙ্গালী পিতামাতার এই উপদেশকে শিরোধার্য্য করে অনেকেই এরি মধ্যে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়েছে বলেও খবর পেয়েছি। আর আমরা, যাদের প্রভাব বাপ-মায়ের উপর একটু বেশী, পড়া শুনার আগ্রহতিশয্য দেখিয়ে ও নানা রকমে মা'দের আশ্বাস বাণী শুনিয়ে হোষ্টেলে এসে পেঁ ৗছেছি।

সমস্ত দিনটা কেটে গেল আমাদের কর্ম্মোৎসাহের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেও নেমে আসতে লাগলো বিভীষিকার ছায়া। কল্পনায় শুনতে লাগলাম গভীর রাতে আহতদের কাতরানি আর অস্পষ্ট গোঙানি। এর উপর একজন সহপাঠিনী জানালো "জানিস্, আমি খোজ নিয়ে জেনেছি, তোর রুমে দু'দুটো রিফিউজি মারা গিয়াছে।" ব্যাস, সত্য হোক, মিথ্যা হোক তাতে কিছু আসে যায় না। বারবার করে মৃত দু'ব্যক্তির বীভৎস মুখ কল্পনায় ভাসতে লাগলো। এর উপর দেখতে পেলাম প্রায় মেয়েদের ঘরেই বাল্ব নেই। অন্ধকারে রাত কাটাতে হবে ভেবে বার বার শিউরে উঠতে লাগলাম। এর একটা বিধান করা দরকার মনে করে কয়েকজন মেয়ে মিলে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে হাজির হলাম। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিস এ্যানা ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকটি অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শুনলেন ও আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন বর্ত্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে এবং অন্যান্য সকলের অসুবিধা বিবেচনা করে আমাদের একটু মানিয়ে নেওয়া উচিত। আর বললেন, খুব শীগ্‌গিরই কর্তৃপক্ষ এ সকল অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হবেন।

আমাদের ক্লাশের নাসিমা ছিল সব চেয়ে ভীরু ও ছিচ্‌কাঁদুনে। রাগাবার জন্য মাঝে মাঝে তাকে "Woxdoll" বলে ডাক্‌তাম। ভূতের উপর ছিল ওর অগাধ বিশ্বাস। মিস্‌ এ্যানার সম্মুখে ও বেফাঁস বলে ফেললো, বা রে, অন্ধকারে থাক্‌বো কি করে, ভূতের ভয় করে যে।"

অসীম বিরক্তি ভরে ভ্রুকুচ্‌কিয়ে তাকালাম ওর দিকে। ভূতকে যে আমরাও ভয় করিনা, সে কথা হলপ করে বলতে পারিনা; তাই বলে নির্ভীক, অসীম সাহসী অবাঙ্গালী মিস্‌ এ্যানার সম্মুখে সে কথা বলে বাঙ্গালীর নামে "ভীরু" অপবাদ কিন্‌তে রাজী ছিলাম না।

মিস্‌ এ্যানার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল। হেসে বল্‌লেন, তোমাদের দেখছি মরাল কারেজ নেই।"

অপমানের বৃশ্চিক দংশন হ'ল গায়। হতচ্ছাড়া মেয়েটির জন্যই আমাদের উপর এই মিথ্যা অপবাদ। রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে এলাম সেখান থেকে।

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত মেয়েদের মধ্যে। অসন্তোষের চাপা গুঞ্জন, বিরক্তির এক অস্পষ্ট প্রকাশ মেয়েদের মধ্যে দেখা যেতে লাগলো। চতুর্দ্দিকের হাবভাব দেখে মনে হলো, ভিতরে ভিতরে কি এক ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। কিন্তু বেশীদিন এভাব স্থায়ী হলোনা। পূর্ব্বেকার নির্ব্বিকার ও শান্তভাব ফিরে এলো—অসন্তোষের ঘনীভূত ধোঁয়া কোথায় মিলিয়ে গেলো টেরও পেলাম না।

সেদিন ছিল ২৭শে ডিসেম্বরের রাত। পড়াশুনার পরিশ্রম জনিত ক্লান্তিতে চোখের পাতা বুঁজে আস্‌ছিল। কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম কতক্ষণ যে গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম তা নিজেই জানিনা। অকস্মাৎ বিকট চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল! ধড়্‌মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। চতুর্দ্দিক হ'তে সম্মিলিত কণ্ঠে চীৎকার আস্‌ছে, "চোর, চোর, দারোয়ান, দারোয়ান।"

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা তখনো সম্পূর্ণ কাটেনি। ব্যাপারটা সঠিক জানার জন্য প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম। আমার রুমের ঠিক সম্মুখেই ছিল এ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিস্ আইভির বেড্‌রুম। নাইট গাউন পরিহিত অবস্থায় প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তিনি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। সমস্ত মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে মেয়েরা প্রশ্নবৃষ্টি করে চলেছে অথচ একটিরও উত্তর মিলছেনা।

আস্তে আস্তে ওঁর কাছে সরে এসে বললাম, "আপনার কী হয়েছে মিস আইভি?" 'ওহ্, সে আমাকে খোঁচা দিয়েছে," বলে হঠাৎ হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন।

অনেক কষ্টে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করলাম তার সারার্থ হচ্ছে এই : মিস্ আইভি প্রতিদিনকার মত তাঁর নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শিয়রের জানালা খোলা ছিল। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে অনুভব করলেন কে যেন তাঁকে শক্ত একটা রড্ দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। "ও কিছু নয়" মনে করে তিনি প্রথম কয়েকবার উপেক্ষা করলেন ; কিন্তু উত্তরোত্তর খোঁচার পরিমাণ যখন বেড়ে যেতে লাগলো তখন তাঁর তন্দ্রাভাবটুকু সম্পূর্ণ কেটে গেল। চোখ মেলে জানালার দিকে তাকাতেই দেখলেন বিকট এক অস্পষ্ট ছায়া মূর্ত্তি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মোটা আর লম্বা একটি কাঠিনিয়ে তাঁকে খোঁচা দিচ্ছিল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিটা যে কোথায় মিলিয়ে গেল তা আর দেখতে পেলেন না।

ঘটনাটি সম্পূর্ণ শোনার পর মত প্রকাশ করলাম, "ঠিক চোর এসেছিল হোষ্টেলে। বিকট মূর্ত্তি-টুর্ত্তি কিছু নয়। ও একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিভ্রম মাত্র।"

মিস্ এ্যানার মসৃন কপালে সুচিক্কণ রেখাগুলি জেগে উঠলো। যখন তিনি কোন গভীর বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন তখন তাঁর ছোট্ট কপালখানি কোঁকড়ানো চুলের সরু রেখার মত কুঞ্চিত হয়ে উঠতো। তাঁর মুখের কঠোর ভাব ও চোখের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দেখে আমরা একে একে সবাই সরে

পড়লাম। কর্তব্য সচেতন মিস্ এ্যানা থানায় ফোন করলেন। পরের দিন সকাল বেলায় লাল পাগড়ীতে সমস্ত হোষ্টেল আলোকিত হয়ে উঠল।

যথারীতি অনুসন্ধান চললো। বিশেষ কিছু সন্ধান মিললনা। শুধু একটি বেড্‌পোল জানালার ধারে কুড়িয়ে পাওয়া গেল। মিস আইভি বেড্‌পোলটি দেখেই আঁৎকে উঠে বললেন, "ওহ্, সে আমাকে এইপোল দিয়েই খুঁচিয়েছে।"

ইন্সপেক্টরের ঠোঁটে বিদ্রূপের বাঁকা হাঁসি খেলে গেল। কুটিল কটাক্ষ হেনে মিস আইভিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বলুন তো, চোর কোন জিনিস না নিয়ে আপনাকে খোঁচ করলো কেন?"

ইন্সপেক্টরের এই অভদ্র ইঙ্গিতে মিস্ আইভির কর্ণ মূল পর্যন্ত রাগে লাল হয়ে উঠলো। অপমানের তীব্র জ্বালা তাঁর চোখ ঠিক্‌রে বের হতে লাগলো। কিন্তু তিনি এর কোন ও সদুত্তর দিতে পারলেন না। মিস্ এ্যানা পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টারের নির্লজ্জ উক্তি সহ্য করে গেলেন।

উক্ত ঘটনার দিন তিনেক পর মিস এ্যানা—কয়েকটি মেয়েকে তাঁর ড্রইং রুমে ডেকে পাঠালেন।

আমাদের সমাদরের সঙ্গে বসিয়ে বললেন, "নব বৎসরের সুচনা আরম্ভ হবে আজই। পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের ক্লেদ, হিংসা, ইত্যাদি নিঃশেষে মুছে ফেলে আমরা নূতন বৎসরকে বরণ করে নেই সাদরে। আজকের দিনে আমরা একে অপরকে ক্ষমা করে পরস্পরের মঙ্গল কামনা করি।" এতটা বলে মিস্ এ্যানা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরপর তিনি বললেন, "হোষ্টেলের চুরির ব্যাপার মেয়েদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। মেয়েরা কৃত অপরাধ স্বীকার করে যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করে তা হলেই হবে এ ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।"

সমস্বরে সকলে চীৎকার করে উঠলো—এ ব্যাপারে তারা বিন্দু বিসর্গ ও জানেনা।

মেয়েদের মধ্যে আস্‌মা ছিল সবচেয়ে বেপরোয়া। পদপৃষ্ট সর্পিনীর মত গর্জে উঠে বললো, "আপনি নিজে পারছেন না হোষ্টেল ম্যানেজ করতে অযথা দোষ চাপাচ্ছেন মেয়েদের ঘাড়ে।"

কর্ত্তব্যপরয়াণা, বিচক্ষণা ও অতিশয় বুদ্ধিমতী মিস্ এ্যানার উপর এ একটা মিথ্যা অপবাদ। কিন্তু মিস্ এ্যানার কোন পরিবর্ত্তনই হলো না। তিনি বললেন, "হয়ত তাই। কলেজ জীবনে আমাদের motto ছিল, যে আলো আমরা পাচ্ছি তার কিছুটা অন্ততঃ বিতরণ করবো সমাজ-সেবায়। কিন্তু সে উদ্দেশ্য আমার সফল হলোনা।—অসন্তোষের যে ঘন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে তোমাদের মধ্যে সে আমার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার পরিচায়ক।"

আস্‌মা খানিকটা বিদ্রূপের সঙ্গে বললো—"আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ সন্দেহ নাই। লোকে টাকার বিনিময়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু আপনি নিঃস্বার্থ ভাবে—"

মিস্ এ্যানা বিবর্ণ মুখে উত্তর দিলেন "দেখ, আমাদের সংসারে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্য না থাকলেও অভাব নেই। একদিন তুমিই আমাকে paid servant বলে অপমান করতে পেরেছিলে, আজও আবার সেই কথাই বললে।" আর কোন কঠিন প্রত্যুত্তর মিস্ এ্যানার মুখ থেকে বের হলো না।

মিস্ এ্যানা চকিতে একবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"বারোটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকী। পারনা কি তোমরা আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে? নূতন বৎসর কি আরম্ভ হবে আমাদের মনোমালিন্যের মধ্য দিয়ে?" কিন্তু কোনো ফল হলোনা। হলো শুধু অরণ্যে রোদন।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঘড়ির আওয়াজ হলো ঢং ঢং ঢং। তার সঙ্গে মিস্ এ্যানার বেদনা মিশ্রিত ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ভেসে গেল। দুটি স্বচ্ছ জলের ধারা চোখের দুকোন বেয়ে ঝরতে লাগলো।

এরপর একদিন মিস্ এ্যানার সঙ্গে মেয়েদের কোন কথাই হোলনা।

কয়দিন নিঃশব্দেই কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল ঝক ঝকে একখানা নূতন ট্যাক্সি হোষ্টেল প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো মেয়ে বাড়ী যাচ্ছে মনে করে ট্যাক্সির চতুষ্পার্শ্বে মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়ালো, লাগেজ তোলা হলো। সর্বশেষে মিস্ এ্যানা ছোট্ট একটা এ্যাটাচি হাতে করে নীচে নেমে এলেন। বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটিয়ে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করলো—"মিস্ এ্যানা, কোথায় যাচ্ছেন ?"

মিষ্টি হেসে মিস্ এ্যানা উত্তর দিলেন—"অনেক দূর।"

অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর মেয়েরা জানতে পারলো মিস্ এ্যানা চাকুরীতে রিজাইন দিয়ে চলে যাচ্ছেন নিজের দেশে। মেয়েদের এ খবর তিনি আগে জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি। আর জানিয়েই বা কি হবে। নিজের অক্ষমতা নিয়ে তাদের মাঝে থাকতে চান না।

অপরাধীদের বুকের মধ্যে হাপর চললো—এক সঙ্গে। অনুতাপের তীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ হলো মর্ম্মস্থলে। তারা মিস এ্যানার হাত ধরে বললো—"ক্ষমা করুন।" একে একে সব কথাই তাঁকে খুলে বললো—মেয়েদের "মরাল কারেজ" নেই এ কথা বলায় সত্যি ওদের রাগ হয়েছিল, তাই ইংরেজ মহিলাদের ভয় দেখানোর জন্য তারা প্ল্যান করেছিল, কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে মিস্ এ্যানার পরিবর্তে মিস্ আইভিকেই ভয় দেখানো হয়েছে। পরদিন পুলিশের তত্ত্বাবধানে ব্যাপারটা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করলো যে, মেয়েরা আর সত্য ঘটনাকে স্বীকার করতে সাহস পেলনা। তাই মিস্ এ্যানার মিনতি, অনুরোধ সবই ব্যর্থ হয়েছিল।

সমস্ত ঘটনাটি শুনে মিস এ্যানা ধীরে ধীরে বললেন—"তোমরা তোমাদের ভুল বুঝতে পেরেছ শুনে আমি সুখী হলুম। তোমাদের সমবেত স্নেহ-ভালবাসার কথা আমার মনে থাকবে। তোমাদের চলার পথ সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠুক।" সন্ধ্যার মৃদু আলোকে দেখা গেল ছোট্ট ছোট্ট অশ্রুবিন্দু মিস্ এ্যানার কপোলে বালুকার মত চিক চিক করছে।

ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল। অন্ধকারে ট্যাক্সিখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোক আসে আবার চলে যায়—এরমধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু এ যাওয়ার পিছনে রয়ে গেল এক ভুলের ইতিহাস।*

---

* সওগাত ২৯শ বর্ষ, চৈত্র ১৩৫০

চিঠি

[চিঠিও এক প্রকার সাহিত্য। দূর দূরান্তে প্রবাসে থাকা স্বজনদের কাছে চিঠি লিখতে হয়। নিছক প্রয়োজনীয় খবরাদি ছাড়াও তারমধ্যে থাকে মানবীয় স্নেহ প্রীতি, প্রেম-ভালবাসার বহু আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ। লেখার মধ্যে আরো প্রকাশ পায় লেখক লেখিকার জ্ঞান গরিমার নিদর্শন; ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর চিঠির মধ্যেও তারই প্রকাশ দেখতে পাই। স্বামী আশরাফউদ্দীন আহমদ চৌধুরীর নিকট লেখা চারটি চিঠি তার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রথম চিঠি ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসের, দ্বিতীয়টি ১৯৩০ সালের, তৃতীয়টি ১৯৩২ ও চতুর্থটি ১৯৩৩ সালের। শেষের তিনটিই রাজবন্দী কারাবাসীর নিকট। এতে আছে প্রথম জীবনের লেখার স্মৃতি, বিবাহিত জীবনের সংসার ধর্মের কথা। তারপর সাহিত্যিকা হিসাবে লেখনীতে বেরিয়েছে সমাজ জীবনের চিত্র। রয়েছে তাতে দেশ বিদেশের সম সাময়িক লেখা সম্পর্কে ইংগিত। সব মিলে ফুটে উঠেছে জীবনের বিচিত্র রূপ।]

আজিজপুর—

২২-১-২৫

১

প্রিয় আমার!

দু'দিন পরে যে মনে পড়ল! তবুও ভাল, আমি মনে করেছিলাম বুঝি—না বলব না, তুমি রাগ করবে।

আজ ছোট মামা আমায় একটা ছেঁড়া খাতা দিলেন। কি আনন্দ হয়েছে আমার সেটা পেয়ে। ১৩২৭ সনের ২২শে জ্যৈষ্ঠ হ'তে সেটার জন্ম, সেই আমার সর্ব-প্রথম লেখা! বহুদিনের ভুলে যাওয়া খেলাসঙ্গিনীটি যেন

আমায় ডাকল। এমন মিষ্টি লেগেছে সেই হিজিবিজিগুলি। লেখা হিসাবে বোধ হয় সেগুলি কিছুই না। কিন্তু এগুলি দেখে সেই বার বছর বয়সের কত খেলা-ধুলা হাসি-কান্নার কথা মনে পড়ে। একটা দিনেও মানুষের কত পরিবর্তন হয়। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় যে ছোট মামা সেগুলি যত্ন করে রাখাতেই আছে। না হলে এতদিনে মাটিতে মিশত, বড় এলোমেলো আমি-আমার মত এমন অদ্ভুত জীব বোধ হয় দুনিয়াতে আর একটিও নেই। শরীরটা শুধু মানুষের মত, নাহলে পশুর সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিলনা। এটা যে আমার খুব গৌরবজনক তা নয়, কিন্তু কি করি মানুষ হ'তে পারলামনা তো! আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে কি জবাব দেব জান? বলব যে "তুমি আমাকে যেমন গড়েছ তেমনি আছি, অন্য কিছু হওয়া ভাগ্যে ঘটে নাই" বেশ চমৎকার হ'বে না?

আশা করি তোমার শরীর এখন ভালই, তুমি লিখনাতো কিছুই জানার অধিকার নাই বুঝি? আচ্ছা না থাক, ভাল থাকাটাই আমার জন্য যথেষ্ট, তুমি না লেখলে কি হবে? কুশল কামনা—

তোমার—

রাজিয়া

সুয়াগাজী

১, ৪, ৫০

"পত্র পেয়েছি ও ভাল করে বুঝেছি। তবে মুস্কিল কি জান? তোমার বাচ্চাটি অসুস্থ। প্রতি রাত্রেই জ্বর হচ্ছে। দোয়া কোরো।

হিন্দুরা বলে—"জগৎ মিথ্যা, সংসার অনিত্য ও মায়াময়, ইহকাল অনিত্য ও পরকাল সত্য।" তুমি কি বল? আমারতো মনে হয় এসলামে এসবের সমর্থন নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য—মহাবিচারের দিন মুক্তি

পাওয়ার জন্য, পুণ্য ও পাপের সঞ্চয় করার উপায় থাকত না তাহলে। সাধকদের পুণ্যস্মৃতি, হাদিসের অমর বাণী, কোরানের অমৃতধারা এই জগৎ-সংসারেই মানুষকে প্রাণ ও শক্তি দান করে। মানুষ দুনিয়াতে থেকেই সাধনার বলে আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভ করে। সেই দুনিয়া নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়।

তোমাকে দেখার ইচ্ছা হয় খুব। কিন্তু স্বইচ্ছায় তা পূরণ হবার নয়—তা বুঝতে পারি।"

তোমার
রাজিয়া

৩

P. 304.
P. O. Circus.
15.6.32

অনেক দিন আগে তোমার পত্র পেয়েছি, তুমি আর লিখলেনা যে :—

কাল তোমার ফরমায়েসী স্পিরিট, কেরোসিন, ষ্টোভের ছুঁচ, সাবান, বিস্কুট ও আষাঢ়ের ভারতবর্ষ পাঠিয়েছি, । পেয়েছ বোধ হয়। বড় ভাই সাহেব লিখেছেন পনের টাকা নাকি তোমার জন্য পাঠিয়েছেন, যদি না পেয়ে থাক লিখবে আমি পাঠাব। আমার কাছে এপ্রিলের প্রথমে মফিজের যাওয়ার খরচ ইত্যাদি বাবদ দশ টাকা পাঠিয়েছিলেন, আর পাঠাননি, শীঘ্রই পাঠাবেন লিখেছেন। শরিফা নাকি কাজি বাড়ীর বজলুর সঙ্গে মোরাদনগর যেয়ে পৌঁছেছে, বড় ভাই সাহেব সেখান হ'তে আনিয়ে মা'র কাছে দিয়েছেন। ভালই হ'য়েছে। আমি বিয়ে দিতে লিখেছি, ওর যা স্বভাব, সংশোধনের অতীত। আমার আপাততঃ অন্য লোকের দরকার নেই। পরে দরকার হ'লে দেখা যাবে।

এখানে আম্মার ও বাচ্চুর পেটের অসুখ হ'য়েছে। সালেহা, রাবু ও অন্যান্য সব খোদার ফজলে ভাল, বাড়ীতে মা একরকম আছেন। বড় ভাই

সাহেব জ্বরের পর হতে চোখে ভাল দেখতে পাননা লিখেছেন। আমি এখন ভালই আছি, তবে দুর্ব্বলতা যায়না। ঔষধ তো এখনও খাই। ভবিষ্যতের জন্য ভয় হয়। বেঁচে থাকাটা বড় বেশী স্পৃহনীয়ও মনে হয়না। বিধাতার সৃষ্টি এই দুনিয়া কত সুন্দর! কিন্তু মানুষের হিংসা দ্বেষ পঙ্কিল মনের কালো ছায়া কি বিশ্রী! দেখে দেখে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে। মনে হয় পালাতে পারলে বাঁচি।

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবনা বোধ হয়। বিধিদত্ত যে অধিকার তারই জন্য আবার মানুষের কাছে আবেদন নিবেদন করতে মন চায়না।

দাদু এখনও আসেননি। বৌকে নিয়ে দু'একমাসের মধ্যে আসবেন বোধ হয়। কালু এ মাসের শেষভাগে আসতে পারে। এবাড়ী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পাঁচ তলার ছাদ পরশু শেষ হ'বে। বারান্দার কাজও শীঘ্র আরম্ভ হবে।

তোমার শরীর আশা করি ভাল; সর্দ্দি সেরেছে? কোন কিছুর দরকার হ'লে লিখে দিও। "বিচিত্রা" এখনও বের হয়নি। পরে পাঠাব। আগে যে দু'খানা টেবলক্লথ পাঠিয়েছি তা পেয়েছ কিনা কোন দিনই লিখলেনা। আরও দুখানা সেলাই করছি, পাঠাব? বালিশের ওয়াড়ের দরকার আছে? কেমন থাক সর্ব্বদাই লিখতে চেষ্টা করো।

আম নাকি ওখানে বারটার বেশী নেওয়া হয় না? কাল কতগুলি ফেরৎ এসেছে।

রাজিয়া

Janab

Moulvi Ashrafuddin ahmad Chowdhury Saheb.

"A" Class Prisoner.

P. 304
P. O. Circus
8-3-33

দু'সপ্তাহ যাবৎ তোমার পত্র পাওয়া যায় না। আশা করি ভাল আছ। এখানে আমার গলার ব্যথা সেরেছে। কিন্তু আম্মা ও বিনুর গলা ব্যথা হয়েছে ও বিনুর টনসিল খুব ফুলেছে, আমার কাশি সামান্য কমেছে। বাচ্চার গালে ছোট একটা ফোঁড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। বড় বাবা আগের মতই, বড় ভাই সাহেবের পত্র পেয়েছি পরশু, বাড়ীর সব ভালই এক রকম, শীঘ্র আমাদের নিতে আসবেন লিখেছেন, কতদিনে আসবেন কে জানে, আম্মা কিন্তু তুমি না আসতে যেতে নিষেধ করেন। বলেন ছেলে মেয়েদের অসুবিধা হবে। সে যখন বড় ভাই সাহেব আসবেন দেখা যাবে, আমি এখনো কিছু স্থির করিনে যাওয়া বা না যাওয়া।

পরশু "সওগাত" দিয়েছি। গল্প যা বেরোয়, রাবিশ। আজকাল তো প্রায় লেখকদেরই কাজ হ'য়েছে আবর্জ্জনামাথা। যারা নূতন লেখক তারা তো অল্পদিনে নাম করার এমন সুযোগ ছাড়ে না; আর্ট হল আজকাল ঐ। প্রথম প্রথম মেয়েদের নিয়ে এত লঘুতা দেখে ভারি রাগ ধরত। এখন ভাবি ওরা মানুষ নয়। সমগ্র নারী জাতির মধ্যে যে সম্ভ্রম জ্ঞানহীনা দু'চার জন নেই, এমন নয়। কিন্তু তাই নিয়ে এমনভাবে সাহিত্যে স্থান দিয়ে রাখার কি দরকার ?

শরিফার পঞ্চম বার বিয়ে হ'ল গত শুক্রবারে, এক কাবাবওয়ালার সঙ্গে যাক—আপদ তো চুকল, এখন, এখন ওখানে টিকে থাকলে হয়। আমার কাজ নেই অমন চাকরাণী রেখে। ওর কাণ্ড দেখেশুনে আমার মনে হল "শেষ প্রশ্নের কমলের কথা। অতি শিক্ষা ও অশিক্ষার কি একই ফল ফলে নাকি ? আজ পত্রিকায় দেখলাম আমেরিকায় গত জানুয়ারী মাসে এক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে শিক্ষা দেওয়া হবে "বিবাহের উদ্দেশ্য ও পবিত্রতা" "ধর্মের চক্ষে বিবাহ রীতি" ইত্যাদি,। অথচ এদেশে আরম্ভ হয়েছে "বিবাহের চেয়ে বড়" নাম দিয়ে উপন্যাস লেখা। মূলকথা ওরা ওসব দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেছে। তাই আবার পুরানো আদর্শটাই তাদের চোখে নূতন ঠেকছে! এদেশে সমাজ বিপ্লব এখনও শেষ হওয়ার দিন আসেনি। চরমে পৌঁছে শেষ হবে। সেদিন আবার পুরাণা নীতিগুলিই ভাল বলবে, না! আমার বুদ্ধির দৌড় দেখে হেসোনা যেন।

গতবারে ডিমগুলি নাকি নামাতে ভেঙ্গে গেছে। ঘি, দাঁতন, ইংরেজী বইখানা পেয়েছ বোধ হয়। ওর প্রথম কবিতাটা আজিজপুরে থাকতে তুমি আমায় পড়িয়েছিলে। সালেহাকে পড়তে দিয়েছি, খালি দুষ্টুমি করে।

শীঘ্র উত্তর দিও। আমি যদি তোমার মত চুপ করে থাকি। তুমি বন্দী আমি কি মুক্ত? যা তিন প্রহরী, দিন রাত যেন সড়কি উচিয়ে রয়েছেন, কিল, চড়, কামড়, কত রকমের মার। এখন আবার বাচ্চাটাও কিল দিতে ও চুল টানতে শিখেছে। একটু ক্রটি হ'ল এক একজন যেন খেতে আসেন। যা শান্ত বাবা তাদের' হাবলা? বড় ভাই সাহেবকে টাকার জন্য লিখেছিলাম পাঠিয়েছেন কি?

রাজিয়া

To

Ashrafuddin Ahmad Chowdhury Saheb.
"A" Class prisoner.